যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

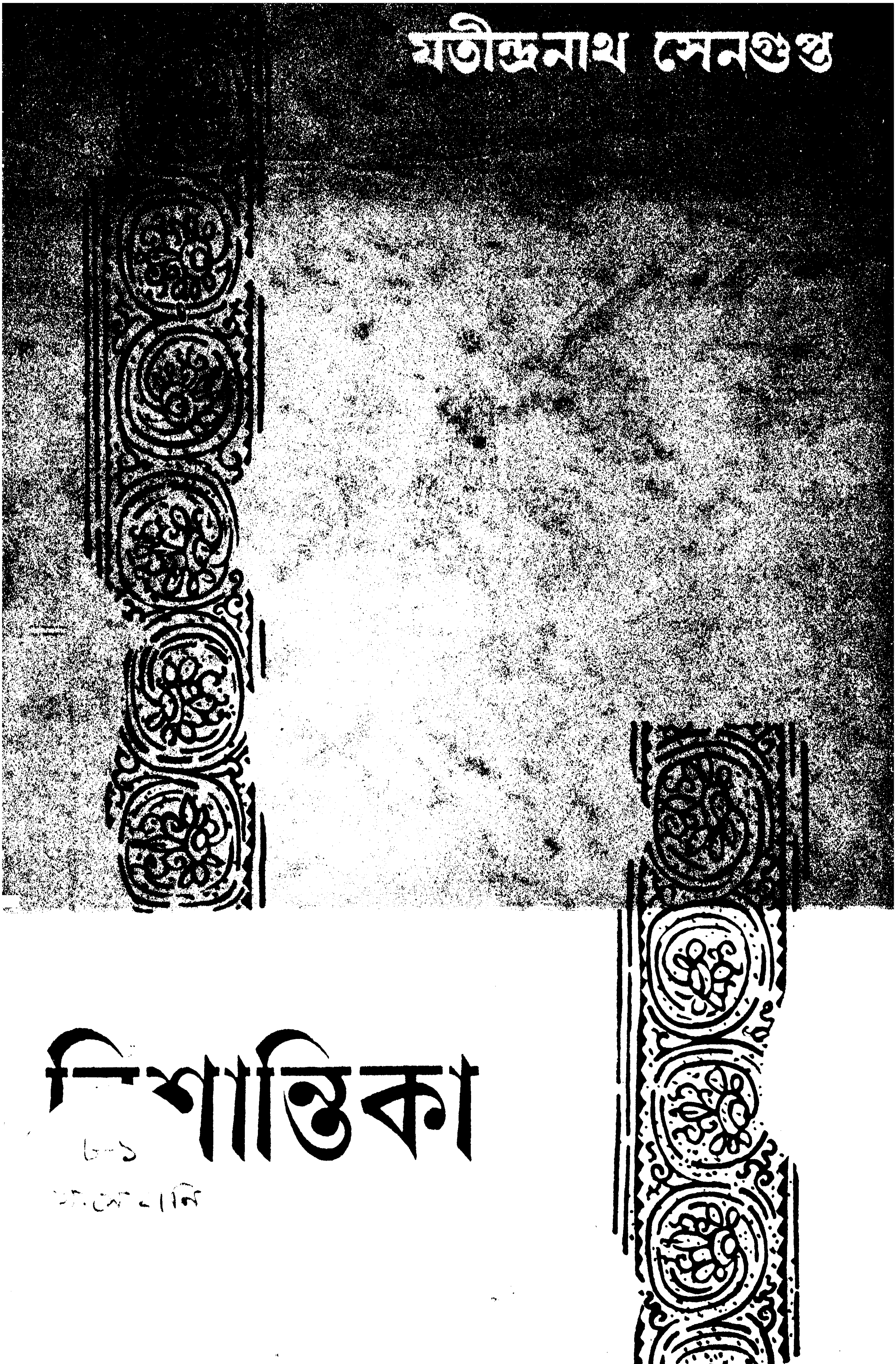

নিশান্তিকা

৮-১
[illegible]

নিশান্তিকা

নিশান্তিকা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বাক্
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৪

বাক্

প্রকাশক বাক্-এর পক্ষ থেকে
তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়
৬৩ কলেজ রো কলিকাতা ৯
মুদ্রাকর : কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী ৭১ কৈলাস বসু স্ট্রীট কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

মূল্য তিন টাকা

নিশান্তিকা

ভূমিকা ॥ অতুলচন্দ্র গুপ্ত

পরিচায়িকা ॥ কালিদাস রায়

ভূমিকা

১

এই কাব্যসংগ্রহের কবিতাগুলির রচনা কাল ১৩৫৪ সালের পৌষ থেকে ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন মাস। মোটামুটি কবির মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্ব থেকে দু বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত। ১৩৫৪ সালে কবিব বয়স ষাট। কবিতাগুলি তাঁর ষাটোত্তর বযসের রচনা। **“সায়ম্”** ও **“ত্রিযামার”** কবিতায় কবির মনের ভাব ও অনুভূতির পরিবর্ত্তনে কাব্যে যে সুরের বদল দেখা দিয়েছিল এ কবিতাগুলি সেই বদল সুরের।

বাংলা সাহিত্যে যতীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি তাঁর তিন খানি প্রথম কাব্যগ্রন্থ। **“মরীচিকা”**, **“মরুশিখা”** ও **“মরুমায়া”**। এর কবিতাগুলি লেখা হয ১৩১৭ থেকে ১৩৩৭ সালের মধ্যে। কবির পরিণত যৌবন প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখা ছোঁয়া পর্য্যন্ত। এ কবিতাগুলির অনাস্বাদিতপূর্ব ভাব ও রস, ভাষার ও প্রকাশভঙ্গিব অগতানুগতিক অমলিন তীক্ষ্ণতা, ঝাঁঝাল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিদ্যুৎ স্ফুরণ, বাঙালী কাব্য-পাঠকের মনে বিস্ময়ের চমক জাগালো। নূতনকে আয়ত্তে আনার বহু আচরিত চেষ্টা তাকে নামের বন্ধনে বাঁধা। সকলে মিলে কবির গাযে একটা লেবেল এঁটে দিলাম। যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদের কবি।

মানুষের ও প্রাণীমাত্রের জীবনে দুঃখ কঠোর সত্য। এ তথ্যকে ভুলে থাকার কি এড়িয়ে থাকার উপায় নেই। কিন্তু ওর “বাদটা” তথ্য নয় তত্ত্ব। অন্য অনেক তত্ত্বের মতই কিছু তথ্য জড়ো ক’রে, বাকী সব তথ্যকে বাদ দিয়ে, মননের একটা কৌশল গড়া যাতে বহুকে এক ক’রে এক ধরণের বোঝার সুবিধা হয়। এ-দুঃখবাদ সভ্য মানুষের সমাজে নূতন কিছু নয়। বৌদ্ধদের চার আর্য বা প্রধান সত্যের একটি হ’লো “সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং”। আমাদের দেশের আস্তিক দর্শনগুলির মত ভিন্ন নয়। জীবন দুঃখময়, দুঃখেই

গড়া। তার মধ্যে সুখ বা আনন্দ যেটুকু থাকে দুঃখের তুলনায় তা অকিংচিৎকর। তার ক্ষণিক ছলনা স্থায়ী দুঃখকেই বাড়ায়। দর্শনের তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য এই দুঃখের আত্যন্তিক বা চরম নিবৃত্তির পথ দেখান। যে পথের সন্ধানে গৃহী গৌতম গৃহহীন বুদ্ধ হয়েছিলেন। বিদেশের দেশে দেশে তত্ত্বচিন্তায় ও সাহিত্যে এই দুঃখবাদের ছাপ। জীবনে দুঃখ এমন সর্ব্বব্যাপী, তীক্ষ্ণ ও প্রকট যে তা না হলেই আশ্চর্য্যের কথা হোতো। 'He alone is happy who never was born'। সুতরাং কবি যখন বলেন

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবনের দুখ।

(মরুশিখা)

তখন নূতন কোনও তত্ত্বের কথা বলেন না।

কিন্তু তত্ত্বের বিচারে কাব্যের বিচার নয়। সৃষ্টির মূল দুঃখে, না আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে সে প্রশ্ন নিরর্থক। যে দেহী মনোময় জীবের দুঃখ সুখ আনন্দের কথা আমরা জানি ও কল্পনা করতে পারি, বিশ্বসৃষ্টির লক্ষকোটি সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহে তারা সংখ্যায় কজনা যে সৃষ্টির মূলে দুঃখ না আনন্দ তার তর্ক তুলি? আমাদের কারবার এই অতি ছোট পৃথিবীকে নিয়ে। তার প্রকৃতির রমণীয়তা ও ভীষণতা, তার গুটিকয়েক সংবেদনশীল জীবের বেদনা ও আনন্দ আমাদের সকল কাব্যের উপাদান। "আর পাবো কোথা?" এই ছোট গণ্ডীর মধ্যে দুঃখ এক প্রকাণ্ড সত্য। একমাত্র সত্য নয়। যেটুকু আনন্দ আছে তা-ও সমান সত্য ; পরিমাণে যতই কম হোক। এই দুঃখের সর্ব্বব্যাপী বৈচিত্র্য যে কবির অনুভূতিকে আবিষ্ট ক'রে কাব্য সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে, তাঁর অনুভূতি যদি সত্য ও গভীর হয়, তাঁর কবিকর্মের যদি ক্ষমতা থাকে সে দুঃখের রসমূর্ত্তি সৃষ্টি করার তবে সে কাব্য আমাদের মনের গভীরে প্রবেশ করে। দুঃখ ও বেদনা আমরা জানি, তার কাব্য-রসের স্বাদ্যমানতার বীজ আমাদের মনেই আছে। যেমন আছে কবির 'অকারণ পুলকে'

ক্ষণিক আনন্দ গানের আস্বাদনের বীজ। কাব্যের রস কেবল মধুর রস নয়, নবরস, অর্থাৎ অসংখ্য রস। সর্ব্বব্যাপী দুঃখ ও বেদনার সার্থক রসমূর্ত্তি সৃষ্টি ক'রে কবি যতীন্দ্রনাথ সাহিত্যে অমর হয়েছেন। কবি যখন 'বহ্নিস্তুতি' দিয়ে কাব্যারম্ভ করেন,

> শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা.
> তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধরো মরীচিকা।
>
> (মরীচিকা)

তখন দুঃখের বিশ্বরূপ ও তার ছলনাময় মূর্ত্তি মনের চোখে ফুটিয়ে তোলেন। যাকে জানি সুন্দর কবি যখন তার মধ্যে দুঃখের জ্বালা দেখেন ও দেখান, "রূপে রূপে তব শিখা", তখন তার যে কাব্যানন্দ সে সেই এক আনন্দ কবি যখন অসুন্দর ও সাধারণের মধ্যে সুন্দরকে দেখেন ও দেখান। এ দুয়ের কবিধর্ম ভিন্ন, কিন্তু কবিকর্ম অভেদ। একে একদেশদর্শী বলা অর্থহীন। সর্ব্বদেশদর্শী দৃষ্টি যদি কিছু থাকে তা কাব্যের দৃষ্টি নয়। সংখ্যেরা বলেন ত্রিগুণের যখন সাম্যাবস্থা প্রকৃতি তখন বন্ধ্যা। গুণের তারতম্যেই সৃষ্টির আরম্ভ। কবি অবশ্য দুঃখের একতারা বাজিয়েছেন, খুব চড়া সুরে, বহু অনুভূতির সিম্ফনি নয়। যে কবির কাব্যে বহু-রসের সিম্ফনি তা ছড়িয়ে থাকে বহু কবিতায়. এক কবিতার অর্কেষ্ট্রায় নয়। ব্যথার বাঁশীতে যখন আনন্দের গান বেজে ওঠে, সে গান আনন্দের ব্যথার নয়। যদিও সেই বাঁশীতেই আবার ব্যথার গান বাজে।

২

শ্রীশশিভূষণ দাশ গুপ্ত তাঁর "কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়" গ্রন্থে শ্রীঅজিত দাসের একটি প্রবন্ধ থেকে যতীন্দ্রনাথের নিজের মুখে তাঁর কাব্য-রচনায় এক ইতিহাস উদ্ধৃত করেছেন। যতীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর কবি হবার আদবেই কোনও অভিপ্রায় ছিল না। তিনি পাশকরা materialist ইঞ্জিনিয়র।

লোহা-লক্কড়, ব্রীজ-কালভার্ট এমন সব ভারী কাজের নিরেট জিনিষ নিয়েই তাঁর কারবার। সুতরাং সমকালীন কবিদের ভাবালুতার আকাশকুসুমের একঘেয়ে ভাপসা মিষ্টিগন্ধে তাঁর মন বিষিয়ে উঠলো। এ-সব কবিদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে জাগলো বিদ্রোহ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাদের আক্রমণের উদ্দেশ্যেই তিনি কবিতা রচনায় হাত দিলেন। কিন্তু বাংলার কবিদল তাঁর বিদ্রূপকেই কাব্যজ্ঞানে "চেঁচিয়ে উঠলেন,—কবি—কবি—কবি"।

যতীন্দ্রনাথের এই কাব্যোৎপত্তির ইতিহাসে সত্য ততটা যেমন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কারের ইতিহাসে গাছ থেকে আপেল ফল মাটিতে পড়ার কাহিনীতে। সর্ব্বব্যাপী দুঃখ বেদনাকে কাব্যের মূর্ত্তি দেবার তাগিদে নয়, বাঙালী কবিদের ভুয়া ভূমানন্দের প্রতিবাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে 'মরীচিকা' 'মরুশিখার' সৃষ্টি এমন কথা কবি নিজের মুখে বল্‌লেও সত্য হয়ে ওঠে না। আকস্মিক উপলক্ষটা কারণ নয়। শিব গড়তে বানর গড়া সহজেই ঘটে, বানর গড়তে শিব গড়ে ওঠে কেবল শিল্পীর হাতে। বাঙালী কবিদের কিছুমাত্র ভুল হয় নাই। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে অনুসঙ্গিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে ছাপিয়ে উঠেছে দুঃখের তীব্র রূপ। যতীন্দ্রনাথ প্যারডি-কার নন, যতীন্দ্রনাথ কবি।

কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কাব্যের উৎপত্তির কাহিনীতে যে টুকু বাহ্যিক সত্য ছিল যতীন্দ্রনাথের কাব্যের উপর তা ছায়া ফেলেছে। যে কবিরা অজানা 'সুদূরের পিয়াসী', সৃষ্টির আনন্দ ও মঙ্গলেই যারা বদ্ধদৃষ্টি, 'উদাসীন আর সবা পরে,' "আঁখি না মেলেই যে ভাগ্যবান পড়ে আলোকের প্রেমে"—তাদের প্রতিনিধি তিনি করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। যে কবির কাব্যসৃষ্টির বিপুল বৈচিত্র্যে মানুষ ও প্রকৃতির সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার, সুন্দর ও ভীষণতার সকল সুরই বেজেছে। যে কবির কাব্য থেকে অতীন্দ্রিয় রসের দীপ্ত প্রকাণ্ড অধ্যায়টা সম্পূর্ণ ছেঁটে দিলেও কবি মহাকবিই থেকে যান। যাঁর বিশাল কাব্য সৃষ্টিকে প্রকৃতির সৃষ্টির মতই কোনও তত্ত্বের কৌটায় পুরে রাখা যায় না। ফলে যখন যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতার রসের

বিরুদ্ধ-রসের সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছেন তখন সে চেষ্টা প্যারডিরই গা ঘেঁসে গেছে। যেমন শরৎ ও সোনার তরী কবিতায়। অথচ যখন দ্বিজেন্দ্রলালের মামুলি গঙ্গাভক্তির প্রতি-স্তোত্রে যতীন্দ্রনাথ লিখলেন,

হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে।
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী,
যুগে যুগে নরনারী-অফুরাণ-আঁখিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী।

তখন তা কাব্য হয়ে উঠেছে। কারণ তার মূলে প্রতিবাদ নয়, অনুভূতি। যদিও 'হিমগিরি-নির্ঝরে' গঙ্গার উৎপত্তি খাঁটি materialist সত্য। কিন্তু কাব্যের কল্পনা তত্ত্বের শাসন মানে না; না বস্তুতান্ত্রিক না ভাবতান্ত্রিক তত্ত্বের।

৩

'সায়ম্' থেকে কাব্যের সুর বদলের মানসিক পরিবর্ত্তনের তত্ত্ব কবি এই সংগ্রহের প্রথম কবিতা "গন্ধধারায়" ব্যক্ত করেছেন।

যে-সুখ বেলি ও চামেলি গন্ধে,
অবশ করিছে এ নাসারন্ধ্রে,
যে-সুখ কাঁপিছে এ মোর ছন্দে—
তা যদি মিথ্যা হয়,
যে দুঃখ তবে হৃদয়ে হৃদয়ে
তুষানল সম ধোঁয়াইয়া দহে,
যে-দুখ বীণার ছেঁড়া তার বহে,
কেন তা মিথ্যা নয়?

কিন্তু এ হচ্ছে তত্ত্বান্বেষীর বুদ্ধির গবেষণা, কবির অনুভূতির প্রকাশ নয়। এ কবিতার অন্যত্র যে অনুভূতির যে প্রকাশ—

গোলাপে কমলে ডাঁটায় ডাঁটায়
যে ব্যথা শিহরে কাঁটায় কাঁটায়

‘সেই ব্যথা ফুটে’ পাপড়ির পুটে,
হ’য়ে ওঠে সৌরভ,—

‘আমার সকল কাঁটা ধন্য ক’রে গোলাপ হয়ে উঠ্‌বে’-র বিলম্বিত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।

“ও অশথ” কবিতায় কবি যখন অশ্বত্থকে জিজ্ঞাসা করেন --

ফাল্গুণের ভাঙা হাটে
সেদিনও পাইনিরে তোরে
অগোণা গাঁঠে গাঁঠে
বয়সের গাছ কি পাথর ;
বয়সের সেই গহনে
চকিতে মন উদাসি’
বাজাল কেমন ক্ষণে’
কে কিশোর এমন বাঁশী ?
তোর অঙ্গভরা জীর্ণজরা
শ্যামে শ্যামে শ্যামময়।
তোর পথে বসা পাতাখসা
জীবন হ’লো মধুময় !
কেমন কোরে এমন হয় ?

ফিরে সেই ঝুরু ঝুরু
চলে নাচ দিনে রেতে
পুরানোর পাঁজর বাজে
নতুনের পাঁয়জোড়েতে।

তখন রসের আনন্দে মন ভরে। কিন্তু এ সুর বাংলা কাব্যের অতি পরিচিত রবীন্দ্রনাথের সুর। যতীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ পৃথক ক’রে এর মধ্যে পাওয়া যায় না।

যে ঋষি-কবিরা পৃথিবীর ধূলিকে মধুময় দেখেছিলেন, সৃষ্টির মূল সত্তাকে তাঁরাই জেনেছিলেন 'ভীষণং ভীষণানাম্'। তাঁরা রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দেখার আর্ত্ত প্রার্থনা জানিয়েছেন, বাম মুখ যে ভ্রূকুটি-করাল তা জানতেন। যতীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি যখন রুদ্রের বামাস্যের হিপ্‌নটিজম্ মুক্ত হয়ে প্রসন্ন দক্ষিণ মুখের উপরেও পড়ল তখন তাঁর কাব্যানুরাগীদের এ আশা অস্বাভাবিক নয় যে তাঁর কাব্যে বেদনা-আনন্দের, আলো-অন্ধকারের যুগলমূর্ত্তির কোনও অপূর্বরূপ ফুটে উঠবে। কিন্তু এই শেষের কবিতাগুলিতে সে আশা পূর্ণ হয় না। কবির সৃষ্টি পাঠকের আকাংখার ফরমাশী পথে চলে না। কিন্তু এ এ কবিতাগুলির নানা রস ও বহু রং পাঠককে মুগ্ধ করবে। কবি যৌবনে কঠোর দুঃখের যে কঠিন মূর্ত্তি সৃষ্টি করেছিলেন তা যদি দগ্ধ হয়ে থাকে তার ভস্মের আগুন এর বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

এ সংগ্রহের একটি কবিতা কারও চোখ এড়াবে না। "খোলা কথা"—প্রেমিক স্বামীর প্রতি সতী-সাধ্বী স্ত্রীর উক্তি।

শুধালে তো কহি প্রিয়,
অপরাধ নাহি নিও,
    যৌবন গেছে—গেছি বেঁচে।
তোমার প্রেমের ভার
দিবা রাতি বহিবার
    গুরুদায় আজ ফুরায়েছে।

সেই যৌবন মম
সেই প্রেম, প্রিয়তম,
    চ'লে গেছে তুমি কাঁদো তাই।
আমি যে বেঁচেছি প্রিয়,
    দু'পায়ের ধূলা দিও
তারে আর ফিরিয়া না চাই।

ছন্দে গাঁথা সত্যের ভীষণতায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কয়েকটি কবিতা টপিকাল্। আশ্চর্য্য টপিকাল্। "দরিদ্রনারায়ণের" কথাবস্তু পলিটিস্যান্‌রা যাকে বলেন 'রেফুজী প্রব্‌লেম্'।

এবার সেবার স্বর্ণযোগ,
ধ্বনিত দিক্ দিগন্ত,
দ্রাবিড় বেলুড় মাড়োয়ার হ'তে
ছুটিছে পুণ্যবন্ত।

যে যেমন পায় কুড়িয়ে নে যায়,
পতিতোদ্ধার-পরায়ণ ;—
বাংলায় আর নর মেলা ভার,
যা আছে সেরেফ নারায়ণ।

ব্যঙ্গ! জমাট বাঁধা তপ্ত চোখের জল।

স্বাধীনতোত্তর দেশে 'তিন চোরের' ছড়া,—

আগে চুরি করে জেল খাটে পরে
নির্বোধ চোর যারা,
আগে জেল খাটে পরে চুরি করে—
সেয়ানা স্বদেশী তারা।

যে-চুরিতে ভাই জেলখাটা নেই
না আগে না পশ্চাৎ ;
নিরীহ আমরা বাণীর সেবক
তাতেই পাকাই হাত।

বদল সুরের শ্রেষ্ঠ কবিতা দিয়ে শেষ করি।

দেখা দাও দেখা দাও।
আলো নিবিবার আগে একবার
সুন্দর, মোরে দেখা দাও।

তুমি র'য়ে গেলে দেখার অতীত
সব কিছু তাই দেখি কুৎসিত,
দেখার এ দোষ যাবে না যদি না
দেখা দাও।
অপরূপ রূপ আঁখির সমুখে
আপনি যদি না ফুটে
অপরের ডাকা নামে বারে বারে
ডাকিতে কি মন উঠে ?

*　　*

কণ্ঠে তোমার—যে মালা দুলাই
হয় তা শুষ্ক ম্লান,
যে ধুপেই তোমা করি গো আরতি
ভস্মে সে অবসান।
এ জ্বালা আমার যায় না কিছুতে
তাই ছুটি মরীচিকার পিছুতে
সারা জীবনের নয়নাশ্রুতে
চির সুন্দর, দেখা দাও। ('দেখা দাও')

সন্দেহ নেই আলো নেবার আগে চিরসুন্দর কবিকে দেখা দিয়েছিলেন।

কার্ত্তিক, ১৩৬৪।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

॥ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কবির অন্যান্য রচনা ॥

মরীচিকা : : ১৩৩০
মরুশিখা : : ১৩৩৪
মরুমায়া : : ১৩৩৭
কাব্য-পরিমিতি : : ১৩৩৮ (প্রবন্ধ)
সায়ম্ : : ১৩৪৮
অনুপূর্বা : : ১৩৫৩ (সংকলন)
ত্রিযামা : : ১৩৫৫

॥ অনুবাদ ॥

গান্ধী-বাণী কনিকা : : ১৩৫৫
কুমারসম্ভব : : ১৩৫৬
রথী ও সারথী : : ১৩৫৭

॥ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনুবাদ ॥

ম্যাক্‌বেথ
হ্যাম্‌লেট
ওথেলো
এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা (আংশিক)

পরিচায়িকা

বাংলার অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্র শান্তিপুরের নিকটবর্তী হরিপুর গ্রামে মধ্যবিত্ত বৈদ্যবংশে ১৮৮৭ সালের ২৬শে জুন কবি যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে কবি খুব কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। নানারূপ অসুবিধার মধ্য দিয়ে তাঁকে শিক্ষালাভ করতে হয়। কবি ১৯০৩ সালে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী থেকে এন্ট্রান্স, ১৯০৫ সালে জেনেরাল এসেম্ব্লি থেকে এফ-এ এবং ১৯১১ সালে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি. ই পাশ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে পাশ ক'রে বেরোবার আগেই একুশ বছর বয়সে কবির বিবাহ হয় হাজারীবাগ-প্রবাসী একজন প্রসিদ্ধ উকিলের কন্যা জ্যোতির্লতাদেবীর সঙ্গে।

কবি প্রথমে ই.আই.রেলের সার্ভেয়ার হয়ে ১৯১১ সালে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। এক বছর পরে নদীয়া জেলাবোর্ডে প্রথমে কর্মে ব্রতী হ'ন—পরে ডিষ্ট্রিক্ট ইনজিনিয়ারের পদে উন্নীত হ'ন। ১৯২৩ সালে তিনি সে কাজ ছেড়ে দিয়ে কাশিমবাজার রাজ এষ্টেটে ইন্‌জিনিয়ারের কাজ গ্রহণ করেন—এই কাজে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাহাল ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর মাত্র ৪ বৎসর জীবিত ছিলেন —১৯৫৪ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর হৃদ্‌রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন।

এই হলো কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী। কবির সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হয় শিবপুর কলেজে পঠদ্দশায়।

নদীয়া জেলা বোর্ডে চাকরি করবার সময় তিনি মাসিক পত্রে কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন। ২।৩টি কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর কবিতা রসজ্ঞ পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দু'বছরের মধ্যেই তিনি অসামান্য কবিখ্যাতি লাভ করেন সাহিত্যিক সমাজে।

তারপর ক্রমে তাঁর নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়।

মরীচিকা (১৩৩০), মরুশিখা (১৩৩৪), মরুমায়া (১৩৩৭)। কাব্য-পরিমিতি—(কাব্যরসবিচারের পুস্তক ১৩৩৮), সায়ম্‌, (১৩৪৮), ত্রিযামা (১৩৫৫), অনুপূর্বা (সংকলন, ১৩৫৩ ও ১৩৬১)।

নিশান্তিকা কবির শেষ পুস্তক। কবি তাঁর দ্বিতীয়ার্ধ জীবনকে রাত্রিকাল কল্পনা ক'রে—এই জীবনে রচিত কবিতার বই তিনখানিকে সায়ম্‌, ত্রিযামা ও নিশান্তিকা নাম দিয়েছেন। নিশান্তিকা কবির নিজেরই দেওয়া নাম,—জীবৎকালে এই বই প্রকাশিত হয়নি।

ত্রিযামা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ অনার্সে ও অনুপূর্বা এম-এ পরীক্ষার অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে।

কবির বহু প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, কেবল কাব্যের রসবিচারের নিবন্ধগুলি কাব্যপরিমিতি নামে রসচক্র কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

কবি শেকস্‌পীয়ারের ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো ও এণ্টনি ক্লিওপেট্রা (আংশিক)—এই চারখানি নাটকের অনুবাদ করেছেন। এগুলি গ্রন্থাকারে এখনো প্রকাশিত হয়নি। কবির কুমারসম্ভব কাব্যের একখানি স্বচ্ছন্দ অনুবাদগ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণ হয়েছে। এইগুলি ছাড়া—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অবলম্বনে রচিত 'রথী ও সারথি' এবং মহাত্মা গান্ধীর বাণী অবলম্বনে রচিত 'গান্ধী বাণীকণিকা' নামে দুখানি ছোট কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ কবি দেখে গেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কবির কাব্যগুলির পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ক'রে একখানি সমালোচনা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন।

কবি যতীন্দ্রনাথ নিভৃতে কাব্যলক্ষ্মীর সেবা করতেন,—তিনি বরাবর লোক-সংঘট্ট এড়িয়ে চলতেন। কোন সভাসমিতি, মজলিশ বা সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না, এমন কি পরিচিতের সংখ্যাও তিনি বাড়াতে চাইতেন না।

যশ মানের লোভ তাঁর ছিল না। তাঁর সম্বন্ধে বলা চলে—"গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ" অর্থাৎ যশঃসম্পদ তাঁকে বরণ করেছিল।

তিনি যশঃসম্পদকে কোনদিন অন্বেষণ করেন নি। কবি তাঁর রচনার প্রচারের জন্যও কোন চেষ্টাই করেন নি—এমন কি নামজাদা মাসিকপত্রেও কোন দিন কবিতা ছাপাননি। বৈষয়িক জীবনেও তাঁর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁর পেশার সম্বন্ধে যে অপবাদ বা দুর্নামের কথা প্রচলিত আছে, তা তাঁকে একেবারেই স্পর্শ করেনি। নিষ্কলঙ্ক স্মৃতি ও প্রভুর সশ্রদ্ধ প্রীতি নিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কবি হিসাবে তিনি বড়,—মানুষ হিসাবে তিনি আরো বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন কঠোর নিয়মনিষ্ঠ, সংযমী ও সত্যসন্ধ পুরুষ। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধের জন্য জীবনে অনেক ক্ষতিই স্বীকার করেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথকে দুঃখবাদী কবি বলা হয়। তিনি এই 'দুঃখালয় অশাশ্বত' জগতের দুঃখকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারেননি, দুঃখের কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও খোঁজেন নি—দুঃখকে সুখের প্রসবব্যথা ব'লেও নিজের মনকে ভোলাতে পারেন নি। দুঃখকে তাঁর কাব্যে এড়িয়ে না গিয়ে তিনি দুঃখদেবের সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করেছেন। তিনিই কবিগুরুর ভাষায় বলতে পারতেন—

"দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে।"

তাঁর কবি-দৃষ্টি ছিল দুঃখাভিমুখী ও সত্যানুসন্ধানী। এই দৃষ্টি হয় তাঁর সহজাত, নয়ত কাব্যসাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যসৃষ্টির জন্য সচেতন ভাবে অনুশীলনের ফল। তাঁর জীবন থেকে স্বভাবত: এই মানসী দৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে একথা বলা যায় না। কারণ, তাঁর জীবন সত্যসত্যই দুঃখময় ছিল না। পারিবারিক জীবনে তিনি পরিতুষ্ট ও সুখীই ছিলেন, সামাজিক আবেষ্টনে তাঁর প্রফুল্লতা ও সজীবতার অভাব ছিল না। গার্হস্থ্য জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য তিনি আকণ্ঠ উপভোগ করেছিলেন। কর্মজীবনের বিরুদ্ধেও কখনো তাঁকে অভিযোগ করতে শুনিনি। সাহিত্যিক জীবনে তিনি অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন সাহিত্যসেবার গোড়া থেকেই। এদেশে তার বেশি সম্ভব নয়—তা তিনি বুঝতেন।

তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিগত দুঃখ তাঁর দৃষ্টিকে বিষাক্ত ক'রে সৃষ্টির মাঝে সঞ্চারিত হয় নি। সৃষ্টিরই নিজস্ব দুঃখ, অপূর্ণতা, অঙ্গহানি ও অসঙ্গতি তাঁর সত্যজিজ্ঞাসু চিত্তকে অস্বস্তিতে বিচলিত ও উদ্বেলিত ক'রে তুলেছিল। এসব অন্য কবিদের হয় ত চোখেই পড়ে না, পড়লেও তাঁরা সমবেদনায় বিগলিত বা ভাববিহ্বল হয়ে পড়েন। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যাকে 'সাহিত্যের সত্য' বলেছেন—যতীন্দ্রনাথের অতিরিক্ত সত্যনিষ্ঠ চরিত্র ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা শাণিত চিত্ত—তাকে কবি-কল্পিত বস্তু বলেই গণ্য করেছিল। কঠোর বাস্তব সত্যের প্রতি তাঁর পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভব হয়নি। বাস্তব সত্যকেই তিনি সাহিত্যের সত্য ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। বাস্তব সত্যের স্থান ছিল কাব্যসাহিত্যে গৌণ। কবি তাকেই কাব্যে মুখ্য স্থান দিয়েছিলেন এবং সাহিত্য ও সামাজিক জীবনের গতানুগতিক ভাববিলাসী ও স্বপ্নমূলক সংস্কারগুলিকে উপহাসই করেছেন। এই মনোভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল দুঃখবাদ। বাস্তবজগতে আনন্দ আছে বটে, —কিন্তু কবির মতে তা দুঃখের ক্ষণিক বিরতি মাত্র, মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ। কঠোর অপ্রিয় বাস্তবসত্যকে কবিতায় রূপ দিয়ে রসসৃষ্টি করা যে চলে, তা এ যুগে যাঁরা দেখিয়েছেন, যতীন্দ্রনাথই তাঁদের অগ্রগণ্য। যতীন্দ্রনাথ অসামান্য সরস রচনাভঙ্গীর গুণেই কঠোর বাস্তব সত্যকে রসে উত্তীর্ণ করেছেন এবং সকল অসুন্দর, অপূর্ণ, অভাব ও অ-সুখকে উপভোগ্য ক'রে তুলেছেন। গতানুগতিক ভাববিহ্বলতার ধারা পরিহার করার জন্যই, বিশেষ ক'রে কল্পনার লীলাবিলাসকে ব্যঙ্গবাণে ক্ষত-বিক্ষত করার জন্যই বোধহয় তিনি নব্যতন্ত্রীয় কবিদের গুরুস্থানীয়। কিন্তু কেউ তাঁর Serio-comic ও Ironical রচনাভঙ্গীর অনুকরণ করেন নি বা করতে পারেন নি।

কালিদাস রায়

সন্ধ্যার কুলায়,
কলিকাতা-৩৩

॥ সূচীপত্র ॥

গন্ধধারা	১৭
পৌষ-শয়ন-সুখে	১৯
হে রাম	২২
ইলাবাস	২৫
প্যাথিবিভ্রাট	২৭
সুপ্তিলোক	৩২
গোটাকয়েক টাকা	৩৪
খোলা কথা	৩৬
সুখভোগ	৩৯
ভাঙণ পথে	৪২
হেন প্রীতি	৪৩
চোখোচোখি	৪৪
হাসি	৪৫
ভিখারী	৪৮
বৃন্দাবনে	৫১
ও অশথ	৫৪
একলা ঘুমো	৫৬
দরিদ্রনারায়ণ	৫৭
দ্বৈত ব্যর্থতা	৫৯
বৃথাশ্রম	৬০
দেখা দাও	৬১
সময়বিৎ	৬৩
ডুগ্‌ডুগি	৬৫
বাঘ-ছাগলের কথা	৬৭
কবি নহি	৭০
ছড়া	৭২
ক্যাক্‌টাস্	৭৩
বোশেখী ছড়া	৭৫

॥ নিশান্তিকা ॥

বৃক্ষরোপণ ৭৮
অবসর ৭৯
ভয় কি ৮০
শীতের কমল ৮২
স্বাধীনতার সূর্য ৮৩
হাটের কবি ৮৫
দুবেলা দুমুঠো ৮৮
জন্মদিন ৮৯
টুকরো ৯০
এদিক ওদিক ৯৪
আগমনী ৯৭
ভোর হ'য়ে এল ৯৯
পরাভব ১০১
অস্ত ১০৩
পেট ও মাটি ১০৫
আসছে জন্মে ১০৮
মোহিতলাল ১১০
কবিবন্ধু কালিদাসের প্রতি ১১১
মিতা কবি যতীন্দ্রমোহন ১১৩

॥ অনুবাদ ॥

কোজাগরী ১১৫
বাঁশ-বাগান ১১৬
স্বচ্ছ নদীর বালিকা ১১৭
একক শয়নে ১১৭
মুঞ্জ তৃণ ১১৮
উইলো পাতা ১১৮
কম্‌লা পাতার ছায়া ১১৯
বিয়ের প্রস্তাব ১২০
বসন্তে বাদল ১২১

॥ নিশান্তিকা ॥

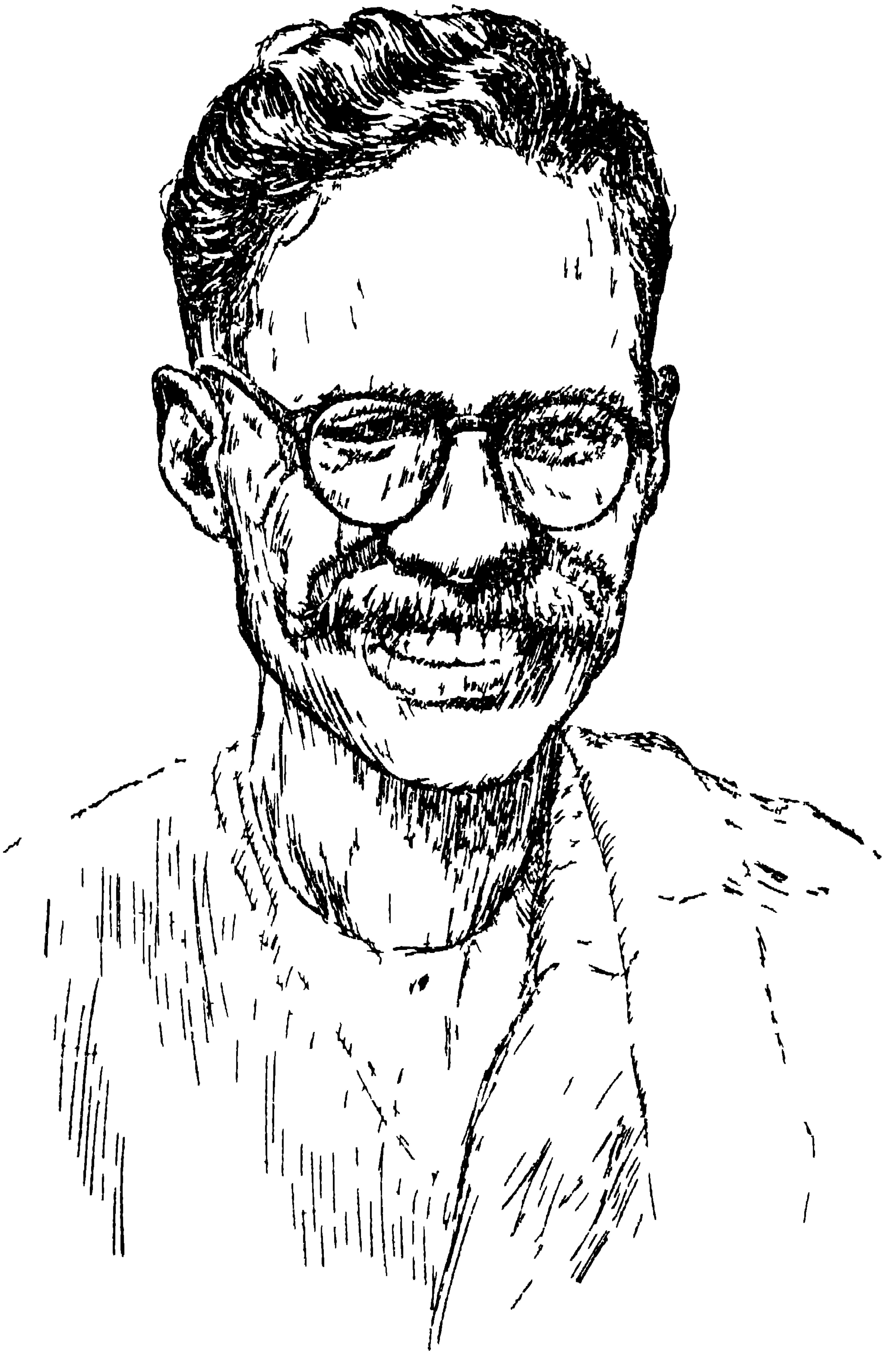

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জন্ম শে জুন ৮৮৭

মৃত্যু : ৭ সেপ্টেম্বর ৯৫৪

নিশান্তিকা

গন্ধধারা

ফুলের গন্ধ বাজে মোর বুকে,—
বন্ধু, তোমারে ক'য়েছি আগে ;
এখন গন্ধ মন্দ লাগে না,
ফুলের গন্ধ ভালোই লাগে।
এখন বোশেখে প্রতি ভোরবেলা
যতনে চয়িত মল্লিকা বেলা
চাঁপা চামেলীর নানান্ ঝামেলা
কবির টেবিলে নিত্য,
ফুলদানি ডিসে কত ফিস্‌ফাস্,
চাপা অধরের কাঁপা উল্লাস,
গন্ধে ভরিয়া ঘরের বাতাস
ম' ম' করে মম চিত্ত।

দুধের পেয়ালা সদ্যস্ফুট,
হৈয়ঙ্গবীনমাখা বিস্কুট,
মক্ষিকা আসি জুড়ে করপুট,
রসনাসরস ঘ্রাণে ;
কুহুরবে দিক্ করে চম্‌চম্
শব্দে গন্ধে প্রাণ ছম্‌ছম্
এত দিনে হয় হৃদয়ঙ্গম
দেহধারণের মানে।
গোলাপে কমলে ডাঁটায় ডাঁটায়
যে ব্যথা শিহরে কাঁটায় কাঁটায়,
সেই ব্যথা ফুটে' পাপড়ির পুটে,
হ'য়ে ওঠে সৌরভ,
কোমল বুকের যা-কিছু বেদন,
গন্ধ যে তারি মূক নিবেদন,—
সারা যৌবন দিয়ে তা বন্ধু,
ক'য়েছিনু অনুভব।

ফুলের গন্ধ শূলের মতন
বিঁধিত যে মোর দিল্—
আজ বুঝিয়াছি সেটা শুধু, সুখে
থাকিতে ভূতের কিল।

যে-সুখ বেলি ও চামেলি গন্ধে,
অবশ করিছে এ নাসারন্ধ্রে,
যে-সুখ কাঁপিছে এ মোর ছন্দে—
তা যদি মিথ্যা হয়,

যে দুঃখ তবে হৃদয়ে হৃদয়ে
তুষানল সম ধোঁয়াইয়া দহে,
যে-দুখ বীণার ছেঁড়া তার বহে,
কেন তা মিথ্যা নয় ?

দুঁহু কোড়ে কেঁদে গেল যৌবন,
কাঁদে আজ জরা-জড়ানো জীবন,
কাঁদিয়া অন্ধ করিনু নয়ন,
কি ফল লভিনু তাহে ?

যাবার বেলায় তাই ফুল আনি,
যতনে সাজাই ভাঙা ফুলদানি,
মহাতৃষাতুর এ মহাপ্রাণী,
রসের পেয়ালা চাহে।

বৈশাখ : ১৩৫৫

পৌষ-শয়ন-সুখে

পৌষ-শয়ন-সুখে—
পালঙ্কে কৌতুকে
নিদ্ যাই,—নিশি নিস্তব্ধ ;—
সহসা দূর-শ্রুত
দিগ্‌বলয়-চ্যুত
অশ্রুপ্লুত একি শব্দ !

পল অনুপল গণি'
নিকট হ'তেছে ধ্বনি,
প্রহর কাঁপিছে থরথরিয়া,
সংশয় শঙ্কায়
সচকিত মন ধায়
ধ্বনির প্রতিধ্বনি ধরিয়া।

লৌহ বর্ত্মচারী
আসিছে ছুটোর গাড়ী।
বাষ্পরুদ্ধ তারি আর্তি ;
বুকে বহি' ঘরছাড়া
রাতের শয়ন-হারা
আঁধার পথের বাঁধা যাত্রী!

জেগে বসে গিরি বন
উচাটন উন্মন
ধ্বনিত তেপান্তরী তিমিরে,
তপ্ত শয়ন ছাড়ি'
স্বপ্তি দিল যে পাড়ি
শিশির-সজল শীত সমীরে।

কালের ঝরনাতলে
কলস নামায়ে রাখি’
নিশীথিনী কালো মেয়ে
হ’ল সে আনমনা কি ?
উপচি’ যায় যে তার কলসী ;-
উজ্জ্বল কল-কল—
কলিত ধ্বনির ধারা
কালো কলসের গায়ে
গড়ায় বিরামহারা
ফেনায় পুঞ্জতারা ঝলসি’ ।

প্রসারিত ছায়াপথে
কে আসিছে মায়ারথে ?
সে আছে তাহারি পথ চাহিয়া,
জলভরণের ছলে
এসেছে নিঝর তলে
উপলকীর্ণ পথ বাহিয়া ।

সহসা শুনিল ধনী
অদূরে বাঁশীর ধ্বনি,
চমকি’ কলসী তুলে কক্ষে,
নিকটে আসিল দূর
কাঁপে হিয়া দুরুদুর,
কাঁচুলি কাঁপিয়া বসে বক্ষে ।

দুর্গমে দিয়ে পাড়ি
থামিল ছুটোর গাড়ি,
নামিল উঠিল কত যাত্রী।
কালো মেয়ে যারে চায়
সে তো নামিল না হায়,
গগনে গড়ায়ে যায় রাত্রি।

ফিরিবার পথে ঢালি'
ভরা ঘট করে খালি,
তারি ধ্বনি শুনি সুখ-শয়নে।
এ শীতে শয্যাহারা
পথের পথিক যারা
তাদের সুপ্তি লাগে নয়নে।

যে অভিমানিনী মেয়ে
ফিরে গেল চেয়ে চেয়ে—
ধ্বনির যমুনাপথ ধরিয়া,
স্মরিয়া তাহারি মুখ
ভরিয়া উঠিছে বুক
পৌষ-শয়ন-সুখ হরিয়া।

পৌষ : ১৩৫৪

হে রাম

বনের বানর পাইয়া হে রাম
দিলে প্রার্থিত বর,—
প্রতিশোধ তরে পিতৃঘাতীরে
বধিবে ব্যাধের শর।

তুমি এলে যেই শ্যামসুন্দর,
মানুষে করিলে ব্যাধ
মৃত্যুশায়ক হানি' সে গোপনে
পূরাল' পাশব সাধ।

ছুটে এলে পাশে সে কী দেখিল সে !-
ধূলায় লুটাও রাম,
বাণ-বেঁধা বুক হাসিমাখা মুখ,
বলে গেলে—'ক্ষমিলাম।'

না চাহিতে রাম, দিয়ে গেলে বর—
ব্যাধের স্বর্গবাস
মানুষ বুঝিল স্বর্গ এ নয়—
এ তার সর্বনাশ।

কত কাল কেটে গেছে তারপর ;
স্বর্গে মেলেনি সুখ
ধ্যান করে নর বাণ-বেঁধা বুকে
সেই হাসিমাখা মুখ।

কত মুনি ঋষি সন্ন্যাসী ক্রুশী,
কত তপ কত তাপ,—
মানুষের শরে নারায়ণ মরে ;
খণ্ডে না এই পাপ।

কোথা আছে সেই মরা নারায়ণ,
মানুষ খুঁজিয়া ফিরে ;—
সূর্যে না সোমে পাষাণে কি ব্যোমে
গির্জায় মন্দিরে।

এল কি রে দিন ধুয়ে মুছে দিতে
সেদিনের অপরাধ,
মানুষের মহাপরীক্ষা তরে
ভগবান হ'ল ব্যাধ ?

বাণ-বেঁধা বুকে হাসিমাখা মুখে
সে শুধু 'হে রাম' বলি'
সাষ্টাঙ্গের প্রণামে প্রণমি'
ধূলায় পড়িল ঢলি' !

এ নহে পুরাণ, এ নহে কাহিনী,
মিছে নয় এক তিলও,-
একের আঘাতে বিশ্বের লোক
'উহু' ব'লে চমকিল।

কেঁদ না কেঁদ না যুগের মানুষ
আজ বড় শুভদিন,
তোমারি ভাগ্যে হ'ল পরিশোধ
চির ভগবৎ-ঋণ।

এবার ত আর নহে অবতার
ঠাকুরের লীলা নয়,
মাটির মানুষ মানুষেরি প্রেমে
হ'ল মৃত্যুঞ্জয়।

সর্ব্বযুগের সব মানবের
তপোঘন মূরতি সে
ডাক দিয়ে বলে দেবতার চেয়ে—
তুমি আমি কম কিসে ?

যুগযুগান্ত মানব-সাধনা
এ যুগে পূর্ণকাম,
চর্মচক্ষে দেখিলাম মোরা
ব্যাধও ব্যাধ নয় :—রাম।

চৈত্র : ১৩৫৪

ইলাবাস

এক বোঁটায় দুটি কুঁড়ি,—
ইলা আর লীলা,
মিতার দুটি মেয়ে।
চোখে মুখে তখনও প্রভাতী শিশির
ঝিক্‌মিক্‌ করছে ;—
ঝ'রে পড়ল ইলা।

মিতানি কাঁদে,
মিতা কাঁদে আর কবিতা লেখে ;
আমায় শুধায়—
মিতে,
কেমন করে ইলাকে ফেরাবো ?
আমি বলি—
যে গেছে তাকে আর ফেরাতে চেয়ো না।
মিতা বলে—না ;
নূতন বাড়ীর পাকা গেটে
পাথর কেটে বসাব—ইলাকে,
আমার নূতন বাসবাড়ীর নাম হবে—
ইলাবাস।

আঙিনায়
বেল জুঁই চামেলির ঝাড়ে ঝাড়ে—
হাজার কুঁড়ি ধরবে,
আর ফুল হ'য়ে ফুটবে—প্রতিদিন।
আমি বললাম—বেশ।
তাই হ'ল,
ইলাবাসে কত কুঁড়ি, কত ফুল।
তারি মাঝে লীলা ফুটে উঠে'
ঠিক দু'পুরে পড়ল ঝ'রে।

আবার কাঁদে মিতানি,
কাঁদে মিতা
ইলাবাসে ব'সে লীলার জন্য।

বেলা প'ড়ে এল ;
মিতানি হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল—
যাই তাদের ফিরিয়ে আনি।
সেই যে গেল, আর ফিরল না।
ইলাবাসে ব'সে মিতা এবার কাঁদে
একা একা।
কাঁদে আর কবিতা লেখে।

দারুণ দুর্যোগ দিনান্তের —
আসন্ন সন্ধ্যান্ধকার !
সহসা বেরিয়ে পড়ল মিতাও,
ইলার খোঁজে
লীলার খোঁজে
মিতানির খোঁজে।
এবার যখন গেলাম ইলাবাসে,
মিতার সঙ্গে দেখা হ'ল না ;
দেখে এলাম—
বেলি চামেলীর ঝাড়ে ঝাড়ে কাঁদছে
আগামী বসন্তের নূতন কুঁড়ি,
আর, ইলাবাসের পাকা গেটে—
শিলাসনে কাঁদছে—ইলা !
দু'গেট বেয়ে ঝরছে—
কত কত বিগত বর্ষার
ঝরা জুঁই।

চৈত্র : ১৩৫৪

প্যাথিবিভ্রাট

সনাতন সার্বভৌমের একমাত্র কন্যা ভারতী ;
সারা পল্লীর দুলালী সে,
তারই হ'ল সঙ্কটাপন্ন পীড়া।
পাড়াতেই থাকেন—দুঃখহরণ আয়ুর্বেদরত্ন মহাভিষক্‌শাস্ত্রী,
তিনিই নিলেন চিকিৎসার ভার।
তাইতো,—সুষুম্না পিঙ্গলা ঈড়া
ত্রিনাড়ী আশ্রয় কোরে ত্রিদোষজ পীড়া !
চলতে লাগল দীর্ঘদিন যথাশাস্ত্র চিকিৎসা।
বটিকা চূর্ণ কষায় আসব
ইত্যাদি সব বিবিধ মহৌষধি।
কিন্তু রোগের মেলে না অবধি,
সে নিত্য চলে বেড়ে।
শাস্ত্রী বল্লেন,—আছে বটে—
চরকে সুশ্রুতে বাগ্‌ভটে
অসাধ্য ব্যাধিরও শাস্ত্রীয় ঔষধ।
উপস্থিত অবস্থায় প্রয়োজন—ক'টি নপুংসক ছাগ
আর যথাবিধানে করতে হবে তাদের বধ।
তারপর যা যা কর্তব্য
সে সব আমিই করবো,
তোমরা কেবল
কৃষ্ণপক্ষে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে
উত্তরাস্য হ'য়ে, স্বামীস্ত্রী একত্রে,
পদ্মপত্রে যে জল
করছে সদাই টলমল,
সেই জল করবে সংগ্রহ ;
সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে—কন্যার জন্মগ্রহ,
মিলিয়ে নিয়ে রাশি গণ
যথাযথ শান্তিস্বস্ত্যয়ন সাঙ্গ কোরে,

ত্রিকটু ত্রিফলা পঞ্চতিক্ত দশমূল
শালপানি বেড়েলা ইত্যাদি
সদ্যতোলা চৌষট্টি মশলাযোগে
পরম শুদ্ধাচারে,
যে মহাভেষজ হবে প্রস্তুত,
তাতেই হবে সুফল ;
আর সে ফল হবে—অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত !

এত দিন রোগী টিঁকবে কিনা
সে সন্দেহ স্বতই উঠল সনাতনের মনে।
ডাকলেন তিনি বিলাতীডিগ্রিধারী
পশ্চিমপাড়ার ডাক্তার মিষ্টার গন্‌কে।
কব্‌রেজ মশাই সুতরাং গেলেন চটে ;
মনে মনে বল্লেন—বটে !
তবে পাড়াপড়শী, আত্মীয়তার স্থান,
আসেন, নাড়ী দেখে যান।

চিকিৎসা করছেন ডাক্তার গন্‌।
খাঁটি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা,—
মলমূত্র রক্তপরীক্ষান্তে
রোগটা যখন পারা গেল জানতে,
চলতে লাগল—
নানা ঔষধ প্রলেপ পট্টি বিবিধ ইন্‌জেক্‌সন।
কিন্তু রোগ গেল এমনই বেড়ে
যে রোগীর ধাতই এল ছেড়ে।
গন্‌ বল্লেন—হার্টের যা অবস্থা, তাতে
যে ট্যাবলেটে হবে সুনিশ্চিত ফল,
এক ক্যালিফর্নিয়া আর মস্কৌতে
তার আছে দুটি কল্‌।

এখানকার আমদানী বা প্রস্তুতি দাওয়াই
বিশ্বাস হয় না ছাই।
ক্যালিফর্নিয়া বা মস্কৌ থেকেই আনা চাই।
যদি হন রাজি—
এরোপ্লেনের ব্যবস্থা ইত্যাদি
সব করতে পারি আজই।

অত টাকাই বা কোথায়?
আর এমন অবস্থায়
অত দেরি সইবে কিনা রোগীর
স্বতই সন্দেহ হ'ল সনাতনের মনে।
নিরুপায় হ'য়ে ডাকলেন
ভিন্নপাড়ার হোমিওপ্যাথ একজনে।
ডাক্তার গন্ গেলেন খুবই চটে;
মনে মনে বল্লেন—বটে!
তবে খবরাখবর নিয়ে থাকেন,
মেয়েটার আর কত দেরি
জনে জনে শুধিয়ে দ্যাখেন।

বন্ধ হ'ল রঙিন্ দাওয়াই প্রলেপ ইন্‌জেকশন্;
চ'লতে লাগলো সূক্ষ্মশক্তি উচ্চ ডাইলিউশন্
তুচ্ছ খাঁটি জল।
তাতেই কিন্তু মনে হ'ল
একটু আধটু ফল।
শুনে, কবিরাজ উঠেন হেসে, ডাক্তার করেন ব্যঙ্গ,-
এই রোগেতে হোমিওপ্যাথি।
হায় রে কপাল,
হাতে ঠেলবে হাতী?
যে কারণেই হোক্—
শেষে হাতী কিন্তু নড়ে!

হপ্তাখানেক পরে রোগীর নাড়ী এল ফিরে,
প্রলাপ থেমে জ্ঞানের কথাই কয় ;—
পাড়াসুদ্ধ সবাই বলে—
হোমিওপ্যাথির জয় !

এরই কদিন পরে আমি এলাম গ্রামে ফিরে।
সকল কথা শুনে দেখতে গেলাম ভারতীরে।
শীর্ণশ্রী শক্তিহারা দেহ
সদ্য ফিরে পাওয়া প্রাণের টাট্‌কা হাসিটুকু
জাগায় বুকে সশঙ্কিত স্নেহ।
মনে হ'ল,—
কি বাঁচাটাই বেঁচে গেছে এবার—
এখন শুধু প্রয়োজন এর,
সুপথ্যের, আর অক্লান্ত সেবার।

বাড়ি ফিরতে পথে হ'ল দেখা,
গঙ্গাস্নান সেরে
মহাভিষক্‌শাস্ত্রী ফিরে আসছেন একা।
কথা উঠ্‌ল ভারতীর ;—
বেঁচেছে না ছাই !
মকরধ্বজ দেওয়া ছিল,—তাই।
মাসখানেক বড় জোর,
তারপরেই দেখতে পাবে
কি যে ঘটে ওর।

নাড়ীতে জ্বর লেগেই আছে ;
ভায়া, নাড়ী বোঝা চাই ;
ইনি উনি যিনিই হ'ন না
নাড়ীজ্ঞান তো নাই।

নমস্কার ক'রে যাচ্ছি চ'লে ;
দেখি—চলেছেন ডাক্তার গন্
জরুরী এক কলে।
আমায় দেখে বল্লেন—কবে এলেন ?
সনাতনের মেয়ের কথা বোধহয় শুনেছেন।
আহা, কোয়াক্ ডেকে মেয়েটাকে মেরে ফেল্লে ওরা !
আমি ত সব দেখছি আগাগোড়া,—
ভিটামিনের অভাব ওর শুকিয়ে দিলে টিস্যু ;
এখন যত পিপু্ এবং ফিস্যু,
বলছে,—মেয়ের রোগ গিয়েছে সেরে !
ফুঃ,—গেছেই যদি সেরে
এক হপ্তার উপর হ'ল
ভাত খাচ্ছে, দুধ খাচ্ছে,
উঠ্ল না কই ঝেড়ে ?
সেই যে গোড়ায় দেওয়া ছিল ডি. ডি. ইন্‌জেক্‌শন্,
তাই এখনো টিঁকে আছে,
    হুঁ,—কতক্ষণ ?

ঘরে ফিরে উঠ্ল মনে নানা কথার ঢেউ,
মেয়েটা যে বেঁচে আছে, হয়ত বেঁচে গেছে,
কি কবিরাজ, কি ডাক্তার ; খুশি নয়কো কেউ
দুজনাতেই চাইছে ওরা বাক্যকায়মনে
হোমিওপ্যাথির বাঁচা রুগী
মরবে কতক্ষণে।

বৈশাখ : ১৩৫৫

সুপ্তিলোক

স্বপনে দুঃস্বপ্ন ভাঙি'
কাঁদিয়া উঠি কহিনু আমি—
স্বপ্ন তবে সত্য ? তুমি নাই !
বুলায়ে হাত সান্ত্বনিয়া
গভীর স্নেহে কহিলে প্রিয়া,—
ছি ছি ছি, অত অধীর হ'তে নাই।

বক্ষে মুখ লুকায়ে কহি—
কেমনে বল শান্ত রহি ?
তোমারে শেষে হারাতে যদি হ'লো !
অসহ মম এ জাগরণ,
কর গো এরে দুঃস্বপন,
ও-মুখ হ'তে নাই-এর ঢাকা খোলো।

ঘামিয়া ওঠা ললাট'পরে
আঁকিয়া স্নেহ ওষ্ঠাধরে
কহিলে তবে এবার আমি যাই ;
পরম সেই পরশ-ঘায
চমকি' ঘুম ভাঙিযা যায ;
দেখিনু—আছ, যদিও পাশে নাই।

স্বস্তিভরে দুর্গা স্মরি'
উঠিয়া বসি শয্যা'পরি,
পড়িল মনে গিয়াছ তুমি দূরে ;
চলিয়া গেছ—কদিন পরে
আসিবে ফিরি আপন ঘরে
শৈশবের স্বজন-ঘর ঘুরে'।

সহসা বুকে শঙ্কা জাগে—
স্বপ্ন, যেটা ভাঙিল আগে,
সেটা না এটা সত্য ? কেবা জানে ?

অঘোর যার ঘুমের গাঙে
স্বপন-মাঝে স্বপন ভাঙে
জাগার তার কি আছে হায় মানে।

এই যে গিয়ে ঘুরিয়া আসা
এ বাসা হ'তে আরেক বাসা
যেমন ভাবে গিয়েছ তুমি মম।
এ দেহে কিবা বিদেহে হোক্
সবই কি নয় সুপ্তিলোক ?
স্বপন-মাঝে স্বপন-ভাঙা সম ?

শ্রাবণ-নিশি স্বপনে দেখে—
কৃষ্ণাশশী অরুণ মেখে
ধূসর হয়ে উষায় মিশে যায়।
চলন্ত মেঘান্তরালে
জড়ায়ে পাখা জ্যোছনাজালে
কাতর চাঁদ উপায় নাহি পায়।

অগণ-দুঃস্বপন-ছাওয়া,
ঘুরিয়া আসে ঘুমের হাওয়া,
শূন্য শেজে নয়ন আসে বুঁজে ?
স্বপন হ'তে স্বপনে যাই,
তোমারি কাছে তোমারে চাই।
'নাই'-এর মাঝে 'থাকা'রে মরি খুঁজে।

সত্য হও সত্য হও,
তুমি ত শুধু স্বপনই নও,
তপনরূপে ভাঙাও মম সুপ্তি ;
দীপ্ত তব কিরণ লেগে,
জাগুক্ বেলা শ্রাবণ-মেঘে,
লাগুক্ মুখে আলোকময়ী মুক্তি।

শ্রাবণ : ১৩৫৫

গোটা কয়েক টাকা

মাসিক আরও গোটা কয়েক
টাকার অভাবে
তিতো ক'রে দিলাম প্রিয়ার
অমন মিঠে স্বভাব

দুঃখ আমার কোথায় ফেলি ?
বাগানভরা জুঁই চামেলী
পয়সাভাবে ফেলছে ঢাকি',
বিম্বাধরের তেলাকুচো ;

কামিনীর কেয়ারি-ঝাড়ে
বনের উচ্ছে লতিয়ে বাড়ে
সহকারের মাধবী আজ
নিমগাছে হ'ল গুলুঞ্চ।

শিউলি ফুলের গোড়ে গাঁথা
স্থগিত রেখে বর্তমানে
চলছে দাওয়াই শিউলিপাতা-
ছেঁচা রসের অনুপানে।

আছে বটে মধুর ছিটে,
তিতো তাহে হয় কি মিঠে ?
নাটার ডাঁটার সুখ্‌তানিতে
যে সুখ তা রসনাই জানে।

এক টাকারও ঘাটতি পূরণ
হয় না করলে হৃদয়-ফুরণ ;
একটি চিঁড়েও ভেজে না হায়
লক্ষ কথায় জল-অভাবে।

থুতু দিয়ে ছাতুমলা
আড়িয়ে শুধুই যায় যে গলা
উগরে তারে ফেলতে নারি,
ভিতর দিকেও কই বা নাবে ?

সন্দেহ নেই সেই প্রয়াসেই
এবারকার এই প্রাণটা যাবে ;—
হায়রে, মাসিক গোটাকয়েক
টাকার অভাবে।

শ্রাবণঃ ১৩৫৫

খোলা কথা

শুধালে তো কহি প্রিয়,
অপরাধ নাহি নিও,
যৌবন গেছে—গেছি বেঁচে।
তোমার প্রেমের ভার
দিবা রাতি বহিবার
গুরু দায় আজ ফুরায়েছে।

এই দেহ এই মন
সাজায়েছি অনুখন
তোমার মনের মতো করি',
পাছে তুমি পাও ব্যথা,
কয়েছি সুখেরই কথা
গতনিদ্ কত বিভাবরী।

জাগর ক্লান্তি ভুলি',
লইয়া পায়ের ধূলি
দিনের সেবায় দিছি মন।
কত কাঁটা পা'য় পা'য়,
ঢেকেছি তা আলতায়,
গঞ্জনা করি আভরণ।

কহিনি মনের সাধ
ঘটে পাছে অপরাধ,
তুমি যে সদাই ক্ষুধাতুর :
দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া
সাজিয়া প্রাণপ্রিয়া
সুধায় ক'রেছ ক্ষুধা দূর।

শুকায়নি ভিজে চুল,
তবু তাহে গুঁজি ফুল
রচিয়াছি সাঁঝের কবরী।
না সারি হাতের কাজ
ক'রেছি রাতের সাজ
তোমার রজনী দিতে ভরি'।
বাড়াতে তোমারি মান
করিয়াছি অভিমান
দু'নয়নে ভরি' জলে ছলে ;
কভু সাজি' অপরাধী
চরণে পড়েছি কাঁদি'
তুমি তাই ভালবাসো ব'লে।
ভুলিয়া স্বজনগণে
জপিয়াছি একমনে
এ প্রাণ তোমারে শুধু চায় ;
উজাড় করিয়া তনু
কত ফুলই যোগায়নু
মালা গাঁথি' পরাতে তোমায়।
জীবন করিয়া ক্ষয়
সযতনে সঞ্চয়
ক'রেছি তোমারি যত দান।
সকল বেদনা ভুলে
হাসিয়া দিয়েছি তুলে
তব কোলে তব সন্তান।
বার বার মা হবার
ব্যথা নহে বুঝাবার,
তাও হায় দিয়ে যায় ফাঁকি।
সহসা চোখের জলে
ধুয়ে যায় পলে পলে
হৃদয় শোণিতে যারে আঁকি ;

লালন-পালন ভার
সেও নহে বুঝাবার
কত দুখ কত জাগরণ !
এক বুকে ছেলে জাগে,
আর বুক বাপে মাগে,
যুবতীর এহি যৌবন !
যে প্রেম যে যৌবন
পুঁথি পাতে সুলোভন
জীবনে তা কোথায় বা রহে ?
যে দুঃস্বপ্ন ঘোর
বহিনু আকৈশোর
যৌবন তারেই তো কহে।
সেই যৌবন তরে
পরম আকুতি ভরে
তিলেক সহনি বিচ্ছেদ।
পড়িয়া ধাঁধায তার,
হায় বিধি বিধাতার,
প্রেম ব'লে চলে নারীমেধ।
সেই যৌবন মম
সেই প্রেম, প্রিয়তম,
চ'লে গেছে তুমি কাঁদো তাই।
আমি যে বেঁচেছি প্রিয়,
দু'পায়ের ধূলা দিও,
তারে আর ফিরিয়া না চাই।
যৌবন নিবাইয়া
যে বিধি জুড়ালো হিয়া,
সে বিধি নারীর হিতকারী।
যদি পায়ে থাকে মতি,
যদি আমি হই সতী,
আর যেন নাহি হই নারী।

ভাদ্র : ১৩৫৫

সুখভোগ

বহু সুখ ভালে লিখিলে বন্ধু,
লিখিলে না সুখভোগ,
সাথে বেঁধে দিলে শিব-অসাধ্য
বিদ্‌ঘুটে এক রোগ।
হোমিও-ঘুমিও-এ্যালো-জল-প্যাথি
আয়ুর্বেদের ঘটে অখ্যাতি,
কিছুতে কাটে না এ ভুতুড়ে ব্যাধি
যত ঝাড়ি তত বাড়ে,
সর্ষের মাঝে আছে বসিয়া যে
সর্ষেরে সে কি ছাড়ে ?

হয়তো পুণ্য ছিল কোন কালে—
সঘৃত অন্ন লিখিলে কপালে,
জুটে নিয়মিত সন্ধ্যা সকালে
ধোঁয়ানো দুধের বাটি !
সে ঘৃতান্নের প্রতি গ্রাসে গ্রাসে
যত নিরন্ন মুখ মনে আসে,
চুমুকে চুমুকে দুধের ছেলের
ক্ষুধার কান্নাকাটি।

এ মোর অন্নে কোন নিরন্ন
জানায় নি প্রতিবাদ।
রসনা-তোষণ ভোজনায়োজন
তবু লাগে বিস্বাদ।
কেহ কহে ইহা দুঃখবাদ গো
কেহ বা বায়ুব্যাধি।
দুখে দুখ পাই, সুখে সুখ নাই,
মুখে হাসি বুকে কাঁদি।

মধুমালতীর মঞ্চে আমার
এসেছে ফুলের বান,
দখিন হাওয়ায় দোল্ দিয়ে যায়
উঠে ঘন সুঘ্রাণ।

তন্বীরা যেন স্তনভারানতা—
ফুলভারে দুলে মালঞ্চলতা,
বসি' তারি তলে সকালে বিকালে
অবসর মোর কাটে।
ঈর্ষাকাতর—পথিকেরা চলে
ধূলি ধূসরিত বাটে।

তারা তো জানে না সে ফুলের বানে
ভেসে চলি আমি কোন্ সে শ্মশানে
ঝরা কুসুমের মরা মুখগুলি
সারি সারি যেথা শুয়ে।
কত ফাগুনের স্খলিত পাতার
ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা ভুঁয়ে।

এ সুখের হাটে দিন মোর কাটে
সুখপরখের দুখে,
যে ব্যথা আমার নহে আপনার
সেই ব্যথা কাঁদে বুকে।

যে প্রেম, বন্ধু, সুন্দর লাগি
চিত্ত গহনে হয়েছে বিবাগী
মাঝে মাঝে ভাবি ছেড়ে ছুড়ে সবই
ফিরি তারি সন্ধানে।
পিছনে তাতল সৈকতে বারি—
বিন্দু সমেরা টানে।

তোহে বিসরিয়া সব মন তাহে
করিনি সমর্পণ,
তাই দোটানায় প্রাণ বাহিরায়,
কি কাজে লাগি এখন ?

সুতমিতদারা খুশি নয় তারা
তুমিও তো খুশি নয়,
হুঁহু যবে বাম মম পরিণাম
দ্বিগুণ নিরাশা নিশ্চয়।

সুখের সাগরে মিলে না সাঁতারি
দুখ মিটাবার এক ফোঁটা বারি
অসহ তিয়াস ঘন বহে শ্বাস
দুটি বাহু বলহীন,—
ঝুটার পিছনে খাঁটির মাতাল
ছুটে বল কত দিন ?

চৈত্র : ১৩৫৫

ভাঙন পথে

শীতলডাঙার রাঙা মেঘের
তনুর ভাঙন বেয়ে
উঠ্‌লে কূলে চিকুর-কালো
শাঙন গাঙে নেয়ে ;

সদ্য ফোটা কাশের ফুলে
যে পরিহাস উঠছে দুলে
সীঁথির মতো অপরিসর
পথের দুপাশ ছেয়ে,—

তার মাঝে আজ ওগো কবি
মিথ্যে খোঁজাখুঁজি,
মিলবে না আর হারিয়ে যাওয়া
ফাগুন রাতের পুঁজি।

যাওগো ফিরে যাও।
ওই ভাঙনের পিছল পথে
শাঙনে ডুব দাও।

আষাঢ় ঃ ১৩৫৬

হেন প্রীতি

এ বয়সে হেন প্রীতি কভু নাহি শুনি,
বুক পাতি' মাগি লয় বুকের আগুনি।

ক্ষীণ দিঠি ভরি' হেরে ধরিয়া চিবুক
ব্যথাবিমধুর বলি-বলয়িত মুখ।

কে জানে কি আছে দুটি জরাভরা দেহে,
জুড়ায় একের দাহ অপরের স্নেহে।

এ উহারে দেখে যেন কভু দেখে নাই,
এই বুঝি শেষ দেখা ভাবে দুজনাই।

কেবা কারে আগে ছাড়ে ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
নিমিখ না ফুরাইতে যুগ অবসান।

কৃশ তনু দুরু দুরু ক্ষীণ বাহু ডোরে
দীপমুখে শিখা যেন মধুনিশি-ভোরে।

বিস্মিত যৌবন জানায় প্রণাম ;
কবি কহে, হেন প্রীতি এই দেখিলাম।

আষাঢ় : ১৩৫৬

চোখোচোখি

সারাটি রজনী জাগিয়া কাটালো কবি
চাহি ঘুমন্ত প্রিয়ার মুখের পানে,
সুপ্ত প্রিয়ার স্বপন রাঙিয়া কবি
'জাগো জাগো জাগো' সাধে গুঞ্জন গানে।

ভোর হ'য়ে এলো ঘুমে ঢ'লে পড়ে কবি,
রাঙা তনু মোড়ি' জাগিয়া বসিল প্রিয়া,
অরুণ নয়নে সাধি' কহে—'ওগো কবি,
জাগো জাগো জাগো, কেন হেন ঘুমাইয়া ?'

দিবস রজনী যাপে পাশাপাশি
কবি আর তার প্রিয়া
কত অনুরাগে এ যখন জাগে
ও তখন ঘুমাইয়া !

চোখোচোখি নাহি হয় ;—
সে ব্যর্থতার দুঃসহভার
বিশ্বভুবনময়।

কবি আর তার পরাণ-প্রিয়ার
মিলনের ব্যবধান
ফাগুনের ফুলে শাওনের কূলে
গাঁথে বেদনার গান।

এ নহে কথার কথা,—
একজোড়া বুকে কাঁদে অধোমুখে
ত্রিভুবন জোড়া ব্যথা।

আষাঢ় : ১৩৫৬

হাসি

বর্ষা-অন্তে আজ
শরৎ প্রাতে
সখা তোমার সাথে
শার- দীয়োৎসবে
মোর হাসতে হবে,
হাসি আসুক বা না আসুক
উচ্চরবে
হাহাঃ হাসতে হবে।

বর্ষার শেষে তব
শরৎ আসে।
সখা মোর সংবৎসর—
মোর বারোমাস।
হায় একই সমস্যা ও
একই সমাস ;
সেই নিত্য অভাব—
খাঁটি অব্যয়ীভাব !
আর ধনে ও ধান্যে তুমি
বহুব্রীহি।

তাই বিকট মিহি
হিহি হিহিঃ হিহি—
যদি হেসে উঠি প্রাণপণে
তোমার হাহাঃ সনে,
বেয়াদবি হ'ল ব'লে
জবাবদিহি
মোর করতে হবে কি
ওগো বহুব্রীহি ?

যে হাসি হাসতে গেলে
মাথা হয় হেঁট
তবু যে হাসি না হাসলেও
ফুলে উঠে পেট,
আজ সে হাসি পেয়ে
ঘোর ‘বিষম’ খেয়ে
যদি কাসতে কাসতে মোর
শ্মশ্রু বেয়ে
ঝরে অশ্রু-বারি,
আর হাসির চোটে
চোখ কপালে ওঠে,
তবে করুণা করি’
ওগো পরাণ প্রিয়
হাসি মুছিয়ে দিও ;
দেখো এত কাল কেঁদে
শেষে হেসে না মরি।

তোমার কেটেছে মেঘ
হাসছ—হোহোঃ
আমার কাটেনি আজও
শনিগ্রহ।
তবু তোমার দেখে
দ্যাখো পড়ছি বেঁকে
ঘন হাসির ঝোঁকে
বুক নামে ও ওঠে,
ফিক্ লাগছে কোঁকে
ফাট ধরছে ঠোঁটে।
ওহো হাসির মোহ !
তুমি হাসছ ব’লেই
আমি হাসছি হোহোঃ।

খিল্ খিল্ ফিক্ ফিক্
মুচকি হাসা,—
ভাই এবারের মত শেষ—
সে সব আশা।
ওই নবনীল নভতলে
মালাগাঁথা বকে হাঁসে
জলে থলে সেই হাসি
কমলে কুমুদে কাশে,
সে হাসিরও ধার
আমি ধারিনে তো আর ;
তাই হোহো—হাসি
হিহি—হাসি
হাসি—হাহাকার।

মোর এ হাসি দেখে
আরো হাসল কে কে,
ওগো বন্ধু আমার,
সে হি— সাব রাখে কে ?
শেষ হাসির কথা
শোন হাসতে হাসতে
হ'লো কপাল ব্যথা,—

এলো জবর খবর
নমঃ শারদীয়ায়ৈ—
কাঁচা ধান ডুবেছে ও
পাকা ধানে মই।

শ্রাবণ : ১৩৫৬

ভিখারী

খেটেখুটে ফিরি শূন্য কুটীরে,
দেহখানা আজ কী অবসন্ন !

কে তুমি ঠাকুর ? এ অপরাহ্নে
গরীবের দ্বারে কিসের জন্য ?

আমার যে নাই কাজের কামাই,
দাঁড়াও, কাঁধের লাঙল নামাই।—
এইবার বল' কি তোমার চাই,
কে তুমি এ গৃহ করিলে ধন্য ?

মুখখানি দেখে মনে হয় ,—আহা,
কতদিন যেন জুটেনি অন্ন।

এমন শত্রু কে ছিল তোমার
গলায় জড়ায়ে দিল ভুজঙ্গ ?

ছেঁড়া বাঘছাল বাঁধিয়া কটিতে
ভস্মে লেপিল ও কাঁচা অঙ্গ ?

মরি মরি, ওকি কাস্তের ঘায়
কপাল কাটিয়া লোহু বাহিরায় ?
এ দশা হ'ল কি বামুন-পাড়ায় ?
তাই খুঁজিতেছ চাষার সঙ্গ ?

ভূতের মতন পারের ছোঁড়ারা
দূর হতে সব দেখিছে রঙ্গ।

বিহানের ফোটা পদ্মের মতো
হাত পেতে তুমি মাগিছ ভিক্ষা,

নাই কাঁধে ঝুলি হাতে করঙ্গ,
ভিখারী হবারও হয়নি শিক্ষা ?

মুঠো ভ'রে যদি চাল দিই ভাই
ফুটিয়ে খাবে যে সে ক্ষমতা নাই,
হেন নিরুপায়ে ঘরছাড়া ক'রে
কোন ঠাকুরাণী লয় পরীক্ষা?
কেমন সতী সে এমন পতিরে
দিল ভবঘুরে হবার দীক্ষা?

দেখিনি এমন পরমদুঃখী,
জন্মও হেন বোকার বংশে,—
নীল হ'য়ে আহা উঠেছে কণ্ঠ
বুকে-তুলে-রাখা সাপের দংশে।
মরি মরি মরি ঢুলে পড়ে আঁখি,
ও বিষ হজম, কথার কথা কি?
আহা-হা এ দশা যে করিল তব
দেখাতে পার কি সেই নৃশংসে?
বুঝে নিই তারে,—আমারো জন্ম
গোঁয়ার বলাই চাষার অংশে।

যাই হোক ভাই, কোন ভয় নাই,
রোজা ডেকে বিষ নামায়ে নিব,
কপালের ক্ষত শুকাবে দুদিনে
স্নিগ্ধ প্রলেপ বাঁটিয়া দিব।
বাঘছালখানা ছেড়ে ফেল ভাই,
ধুয়ে মুছে দিই অঙ্গের ছাই,
মারিয়া তাড়াই সাপের বালাই
সকল অশিব হইবে শিব।
লক্ষ্মীটি হ'য়ে লহ যদি সেবা
তবে তো বুদ্ধি প্রশংসিব।

ভাল হ'য়ে ওঠো,—দুজনে মিলিয়া
লেগে যাব মোরা ক্ষেতের কাজে,
মুখখানি বুঁজে সহো যত ব্যথা
ভুলেও সে কথা তুলিব না যে।
পরস্পরের দুখ লব বেঁটে
বর্ষা ও খরা সমভাবে খেটে
সোনার ফসল ফলাব যখন
রব উঠে যাবে গাঁয়ের মাঝে।
ছি ছি ভাই, এই জোয়ান বয়সে
ভিক্ষা করা কি তোমার সাজে ?

আর যদি তোরে না পারি সারাতে,
দুঃখের বোঝা নামাতে নারি,
দুয়ার হ'তে কি, ওগো অসহায় ,
চাল-মুঠো দিয়ে ফিরাতে পারি ?
সংসারে মোর আছে আর কেবা,
জীবন কাটাব করি' তোরি সেবা ;
দেব্‌তা মানুষ ক্ষ্যাপা কি ভিখারী
যাই হোস্ মোরে যাসনে ছাড়ি ;
সকল ব্যথার ব্যথিত দেখিয়া
দুটি চোখ আজ হ'ল যে ঝারি।

শ্রাবণ—১৩৫৬

বৃন্দাবনে

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে গোপ-গোকুলে
দেবেরও দুর্লভ্য দেবতা ;
যখন খুশি দেখিত যে-সে মাঠে বাটে নদীকূলে,
শিহরে দেহ স্মরিয়া সে কথা।

নগ্ন তনু কটিবসনে আঁটিয়া, করে পাচনি
রাখাল সনে করিতে রাখালী,
সন্ধ্যা হ'লে ফিরাতে গাভী গরীব গোপ-বাছনি
যমুনাজলে গোধূলি পাখালি'।

ভাবিত মায মন কি যায় এমন ছেলে পাঠাতে
রোদে ও জলে গরুর পিছনে,
ভাবিত পিতা গোয়ালা যদি না খাটে বাপ-বেটাতে
মরিতে হবে অন্নবিহনে।

লুব্ধ ছেলে সুযোগ পেলে খাইতে ছানা নবনী
ক্ষুধার দায়ে লুকায়ে চুরায়ে,
পড়িলে ধরা প্রহার দিত ধৈর্যহারা জননী,
পড়িতে কেঁদে ধূলায় গড়ায়ে।

খেল্‌না ছিল বাঁশের বাঁশী বাজাতে বসি' বিপিনে,
শুনিত ধেনু শষ্প-কবলে,
বাহবা দিত রঙ্গভরে, তুমি যে কে তা না চিনে,
মিলিয়া যত সুদাম-সুবলে।

এমনি তব কাটিত দিন গোপনে গোপ-ভবনে
সুখে ও দুখে হাসিয়া কাঁদিয়া
খুঁজিত যত ধ্যানী ও জ্ঞানী মন্দিরে তপোবনে
কত না শত মন্ত্র ফাঁদিয়া।

সহসা কবে না জানি সাড়া জাগিল সারা গোকুলে,
বাঁশরীরবে শিহরে বনানী !
কুহরে পিক, বিহরে অলি মালতী চাঁপা বকুলে,
যমুনাজল বহিল উজানি' !
ফুল্ল নীপ বাড়ায়ে ছায়া দাঁড়াল পথ-কিনারে ;
বধূরা চলে ভরিতে গাগরী,
গাঁয়ের যত আহীরী মেয়ে এ দেখে চেয়ে উহারে,
সহসা সবে রূপসী নাগরী !
চিরকিশোর হেরিয়া যত হৃদয় হ'ল কিশোরী,
উথলে প্রেম আকাশে বাতাসে,
বাজিছে বাঁশী দু'কূল নাশি', ক্ষুধা ও তৃষা বিসরি'
ছুটেছে সবে রুদ্ধ নিশাসে।
বৃন্দাবনে সুন্দরের চলেছে নিতি আরতি,
জানে না কেহ সে কথা বাহিরে ;
মথুরাপুরে রচিত হবে যে যুগ-মহাভারতী
সেদিনও তার চিহ্ন নাহিরে।

সেদিন শুধু বৃন্দাবনে কানুর বেণু শুনিয়া
সখা ও সখী সঁপিছে তনুপ্রাণ,
ঋষির মুখে সেদিনও কোথা উঠেনি বাণী ধ্বনিয়া—
কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান !
ধরি মদনমোহন তনু ফিরিছ বৃন্দাবনে,
মরি গো মরি ধ্যানের দেবতা !
যখন খুশি দেখিত যে-সে পথে ঘাটে উপবনে,
কাঁদিয়া মরি স্মরিয়া সে কথা।
কাঁদিয়া মরি জড়ায়ে ধরি' পাথরে গড়া চরণে,
পাষাণ বুকে কুসুম দুলায়ে,

কাঁদিতে থাকি মূরতি আঁকি অদেখা রূপ স্মরণে
স্বপন দিয়ে আপনা ভুলায়ে।

ছন্দ বাঁধি' মরিছে কাঁদি যুগে ও যুগে কবিরা
রচিয়া গানে তোমারি কাহিনী,
ফুকারি কাঁদে গুমরি সাধে মুরলী বীণা অধীরা,
ভকত-আঁখি অশ্রুবাহিনী।

মিলে'না দেখা সুন্দরের কিছুতে কোথা ভুবনে,
বিশ্ব ভরি' গুমরে সে ব্যথা,
যখন খুশি দেখিত যে-সে যে-রূপ বৃন্দাবনে
সে আজি শুধু ধ্যানের দেবতা।

অগ্রহায়ণ—১৩৫৬

ও অশথ !

ও অশথ, বাৎলে দে পথ,—
কেমন ক'রে এমন হয়

হু হু হু চৈতি বায়ে
জরাজর্জর গায়ে
সহসা কি পুলকে
দুলে উঠে কিশলয় !

তোর দলে দলে কিশলয় !
কেমন ক'রে এখন হয় ?

ফাগুনের ভাঙা হাটে
সেদিনও পাইনি রে তোর
অগোনা গাঁঠে গাঁঠে
বয়সের গাছ কি পাথর ;

বয়সের সেই গহনে
চকিতে মন উদাসি'
বাজাল কেমন ক্ষণে
কে কিশোর এমন বাঁশী ?

তোর অঙ্গভরা জীর্ণজরা
শ্যামে শ্যামে শামময় !
তোর পথে বসা পাতাখসা
জীবন হ'ল মধুময় !
কেমন ক'রে এমন হয়।

পথিকের পথের বুকে
হারানো ছায়া ফিরে।
পাখীরা কলসুখে
ফিরে ফের শাখানীড়ে।

ফিরে সেই ঝুরু ঝুরু
চলে নাচ দিনে রেতে
পুরানোর পাঁজর বাজে
নতুনের পায়জোড়েতে।
মহাকাল হ'য়ে নাকাল
মানে আপন পরাজয়।
কেমন ক'রে এমন হয়?
ও অশথ!

চৈত্র—১৩৫৬

একলা ঘুমো

মিছে নাক ডাকাস্ নে আর
আসবে না সে ডাক শুনে কেউ,
একলা ঘুমো।
ঘুমো তুই, একলা ঘুমো রে !
একলা ঘুমো একলা ঘুমো
একলা ঘুমো রে !
ঘুমো তুই, একলা ঘুমো রে !

এ পথের হয় না সাথী,
কেন এই ডাকাডাকি ?
এ রাতের নেইকো বাতি,
মিছে সব হাঁকাহাঁকি।
আছে তো ছেঁড়া চাটাই, বিছিয়ে নে তাই
আপন গুমরে—
ঘুমো তুই, একলা ঘুমো রে !

আঁধারের পেটের ছেলে
খুঁজিস আজ আলোর আরাম ?
তপনের স্বপন দেখিস
ওরে ও নেমকহারাম !
হ'লি কি—পরের হুমোর চুমোর ভয়ে
হুতুমথুমো রে ?
ঘুমো তুই, একলা ঘুমো রে—।

যে কালোর অন্ধকূপে
সারাদিন কাটালি রে
সে কালোই সন্ধ্যারূপে
তোরে আজ এল ঘিরে ;
বুকে তার—চেতনহারা দুধের ধারা
মুখে চুমো রে।
ঘুমো তুই, একলা ঘুমো রে।

বৈশাখ—১৩৫৭

দরিদ্রনারায়ণ

দেখে এনু প্ল্যাটফরমে-ফরমে
গড়ায় গড়ায় নারায়ণ !
ওপার হইতে তাড়ায়ন পেয়ে
এপারে আত্ম-ভাঁড়ায়ন ।
আহা, যত নর হ'ল নারায়ণ ।

শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম
রাখি কাষ্টম্-ক্ষেত্রে,
অশ্রুমোচন কমললোচন
চাহে হরীতকী-নেত্রে ।
ছোলা কলা হাতে সেবকবৃন্দ
ডাকিছে, তোরা কে খাবি আয়,
ঢেউএ ঢেউএ এসে গাঁদি লেগে ভেসে
নারায়ণ আজ খাবি খায় ।

এবার সেবার সুবর্ণযোগ,
ধ্বনিত দিক্ দিগন্ত,
দ্রাবিড় বেলুড় মাড়োয়ার হ'তে
ছুটিছে পুণ্যবন্ত ।
যে যেমন পায় কুড়িয়ে নে যায়,
পতিতোদ্ধার-পরায়ণ ;—
বাংলায় আর নর মেলা ভার,
যা আছে সেরেফ্ নারায়ণ ।
সে বারের শোধ নিতে ক্ষ্যাপা হর
নারায়ণে তুলে নিয়েছে পিঠে,
ত্রিশূল উঁচিয়ে খুঁচিয়ে কুচিয়ে—
ছড়াবে নব একান্ন পীঠে ।

তীর্থে-তীর্থে পাঁজরা কণ্ঠা
দাপ্‌না টেংরি সকলি পাবে,
প্রাণের চিহ্ন কোথাও পাবে না
কন্যাকুমারী আপঞ্জাবে।

হায় হায় হায় শুধাব কাহায়,—
পদ্মার জল ছিল না কি রে?
কোন্ মরীচিকা মিটাতে দিল না
মৃত্যুপিপাসা সে স্বাদু নীরে?

বৈশাখ—১৩৫৭

দ্বৈত ব্যর্থতা

ইঁট কাঠ চূণ বালি আনাইয়া গাড়ী গাড়ী
সারাটা জীবন শুধু গাঁথিনু পরের বাড়ী।
কত দুশ্চিন্তাই ঘটাতে বাসের সুখ,
আলো হাওয়া জল ড্রেন, পাছে কোন হয় চুক!
সে সব বাড়ীতে মোর কোন অধিকার নাই,
পথে পথে খুঁজি আজ মাথা গুঁজিবার ঠাঁই।

ছন্দ অর্থ ভাব ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বাছি',
সকলি পরের তরে, কবিতা যা গাঁথিয়াছি।
অশ্রুসাগর সেঁচি' অহেতুক কৌতুকে
গাঁথিয়া গাঁথিয়া মালা দুলায়েছি বুকে বুকে।
হায়রে, 'আমার' বলি সে-বুকের মালা কোথা?
যার বিনিময়ে মোর জুড়াবে বুকের ব্যথা?

বরাত সঙ্গে চলে, কিছু নাই বলিবার,
মিথ্যে হইনু কবি, মিছে ইন্‌জিনিয়ার।

বৈশাখ—১৩৫৭

বৃথাশ্রম

চাষা ধান বোনে তাই ধান হয়,
তারা মিছামিছি মরে খেটে,
আহা ভেনে ঝেড়ে দেহ করে ক্ষয়—
তবে তুষের ভেজাল মেটে।

যদি তার চেয়ে বোনে ঝাড়া চাল,
তবে চুকে যায় সব জঞ্জাল,
ক্ষেতে ফ'লে থাকে খাসা খাঁটি মাল,
শুধু রেঁধে বেড়ে ভরো পেটে।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৭

ফুলে-ফুলে-গতি
নম প্রজাপতি
মানুষের প্রতি কি দয়াল,—
একদিন হয়
মালা-বিনিময়
জ্বালাবিনিময় চিরকাল।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৭

দেখা দাও

দেখা দাও দেখা দাও।
আলো নিবিবার আগে একবার
সুন্দর, মোরে দেখা দাও।

তুমি র'য়ে গেলে দেখার অতীত
সব কিছু তাই দেখি কুৎসিত,
দেখার এ দোষ যাবে না যদি না
দেখা দাও।

অপরূপ রূপ আঁখির সমুখে
আপনি যদি না ফুটে
অপরের ডাকা নামে বারে বারে
ডাকিতে কি মন উঠে ?
এস এস এস হে মোর অনামী,
অন্তর্হিত অন্তর্যামী
নিভৃতে গোপনে আমি-হ'তে-আমি
দেখা দাও।

ওগো সুন্দর—তোমারে
দীর্ঘ জীবন কাটে,
মুখে মুখে আর বুকে বুকে এই
অসুন্দরের হাটে।
ভাঙা ছেঁড়া কুচো দিয়ে জোড়াতালি
রূপে রূপে শুধু মিলে চোরাবালি,
কুসুম শুকায় চাঁদ ডুবে যায়,—
দেখা দাও।

গন্ধ ফুকারি' কাঁদে ফুলদল—
'দেখি নাই, দেখি নাই'।

ছন্দ ভুলিয়া কাঁদে মরা নদী,—
'সে কি নাই, সে কি নাই'?

সারা জীবন যে কত কটু কহি',
কেমনে লুকায়ে আছ সবি সহি'?
দুখ দিতে তোমা কত দুখ বহি,—
দেখা দাও।

কণ্ঠে তোমার—যে মালা দুলাই
হয় তা শুষ্ক ম্লান,

যে ধূপেই তোমা করি গো আরতি,
ভস্মে সে অবসান।

এ জ্বালা আমার যায় না কিছুতে
তাই ছুটি মরীচিকার পিছুতে,

সারা জীবনের নয়নাশ্রুতে
চিরসুন্দর, দেখা দাও।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৭

সময়বিৎ

গান যদি তার না থামাতে পারে
সমে অর্থাৎ সময়ে
বুঝিবে কবির মগজ ভর্তি
গব্যে ওরফে গোময়ে।

*
* *

সকল বাঁধন ছিঁড়ে দিলে প্রিয়—
একটি বাঁধন ছাড়া,
ঝন রণ ঝঙ্কৃত বীণা আজ
টুং টাং একতারা।

*
* *

বাদল-দলা যূঁয়ে
গন্ধ গেছে ধুয়ে,
পবন বলে কেন
এখনো বোঁটা ছুঁয়ে?

*
* *

পুঞ্জপত্রে সুনিবিড় শ্যাম নিকুঞ্জ সম্ভবা
গাছভরা রাঙা জবা।

*
* *

আষাঢ় বরষণে
ভিজিছে তরুলতা,
কাননে সারাদিন
স্তব্ধ মুখরতা।
সহসা হাহাস্বরে
একক কোন্ পাখী
জানালো মেঘস্বরে
কি ব্যথা কারে ডাকি'?

গোলাপী চিবুকে দহন আঁকিল
প্রথম প্রেমের ফুল্কি,
সে বলে পরেছি উল্কি।

* * *

ডুবে গেল চাঁদ উবে গেল তারা
নিবিল নিশার আশা,
ছিন্নমালার শুষ্ক কুসুমে
শুকাইল ভালবাসা।

* * *

হৃদয় আমার ঘর ছেড়ে যেতে চায়,—
অজানা ঢেউএর ঘায়
নির্জন কূল ভেঙে ভেঙে পড়ে
সে অতল দরিয়ায়।

আগে চুরি করে জেল খাটে পরে
নির্বোধ চোর যারা,
আগে জেল খাটে পরে চুরি করে—
সেয়ানা স্বদেশী তারা।

যে-চুরিতে ভাই জেলখাটা নাই
না আগে না পশ্চাৎ;
নিরীহ আমরা বাণীর সেবক
তাতেই পাকাই হাত।

আষাঢ়—১৩৫৭

ডুগ্‌ডুগি

ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্‌ডুগি বা···জে ওই,
ঐ আসে ফেরিয়লা পল্লীর মাঝে ওই,
রাতের ভিয়ানো তাজা
নূতন গুড়ের খাজা,
শালপাতাঢাকা ডালা শিরপরে রা···জে, আর
ডান হাতে ডুগ্ ডুগ্, ডুগ্‌ডুগি বাজে তার।

পল্লীর শিশুদল উন্মন চঞ্চল
কেউ ছুটে খেলা ছেড়ে, কেউ মার অঞ্চল ;
কারো চোখ চক্‌চক্
কারো আঁখি ছলছল করছে,
মার পাশে ফিরে এসে
কি বায়না ধরছে।
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ মাঝে মাঝে থামে ওই,
মাথার ডালাটি বুঝি নামে ওই।

কচি কচি মুখগুলি
ঠোঁটের পাঁপড়ি খুলি'
ডালা ঘিরে ভীড় ক'রে কাঁচা রোদে ঘামছে।
দুয়ারে দুয়ারে ডালা উঠছে ও নামছে।

গুড়ে খাজা চুষি চুষি কত খুশি কচি মুখ,
ও বুঝি পায়নি, আহা, কত সয় কাঁচা বুক !
পাকা যারা গৃহকোণে
সে খুশি কেই বা গোণে ?
সে ব্যথা কে আনে মনে, হায় রে !
কচি বুকে ডুগ্‌ডুগি ঢেউ তুলে যায় রে।

ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌ পথে পথে চ'লে যায়,
জরাজর্জর মোরে কি মন্ত্র ব'লে যায়,—
খসিয়া যে পড়ে তার
অস্থিচর্মসার
দেহভার বাসাংসি জীর্ণ;
পলকে চেতনাকুলে
কৌমার পরে তুলে
নব তনু মরণোত্তীর্ণ!

দলে দলে চিরশিশু অম্বরে নাচে ওই,
ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডম্বরু তাতা থৈ তাতা থৈ।
সুলভে ভরিয়া মুঠি
আনন্দে কুটি কুটি
দুর্লভে নাহি লোভ যাহা পায় তাই সই।
মেঘ রৌদ্রের ছাঁদে
এই হাসে এই কাঁদে
মৃত্যুঞ্জয়ী নাচ নাচে শিশু তাতা থৈ।

সাথে সাথে সাথে বাজে
ডম্বরু ডুগ্‌ ডুগ্‌,
অম্বরে ফুটে ফুটে
উঠে নব নব যুগ।

আষাঢ় : ১৩৫৭

বাঘ-ছাগলের কথা

(বনপীরের গান)

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল,—
ওই রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ,—
সুযোগ বুঝে শৃগালমামা ডাক্তার ডাকাইল,
এক সুবিজ্ঞ রামছাগ।

ডাক্তার আসি শৃঙ্গ দাড়ি নাড়ি যুগপৎ
দুই চক্ষু মুদে কয়
কঠিন অপারেশন্ ভিন্ন নাই যে অন্য পথ,
নইলে অক্কা পাবার ভয়।

একদিকে তার মুণ্ড রাখ আর এক দিকে ধড়,
আমি তবে খসাই হাড়,
বেদম্ হ'য়ে আসছে রুগী, হও সবে তৎপর ;
শুনে সবাই নাড়ল ঘাড়।

কেউ কেউ বলেছিল—ক'রো না গো অমন কাজই
এতে বাঘটি যাবে ম'রে,
ডাক্তার ছাগল বলেছিলেন—দেখাচ্ছি ভোজবাজি
আমি দক্ষিণ রায়ের বরে।

সাঙ্গ হ'ল রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের গলা কাটা,
আর বাহির হইল অস্থি,
ভারতজোড়া হরিণ ভেড়া ভাবে চুকল ল্যাটা,
এবার ফিরে পেলাম স্বস্তি।

রক্তরাঙা গাঙের ধারা ভিজে বালির চর,—
আহা   যেন খাঁড়ার দাগ ;
এক পারে তার মুণ্ড পড়ে আর পারে তার ধড়,
হায়   কাটা পড়ল বাঘ।

দক্ষিণরায়ের বরে মুণ্ড তবু ছাগল খায়
তার   ক্ষুধা নাহি মেটে,
পেট নেই তার পেট ভরে কি ? চালান করে হায়
সব   এপারের এই পেটে।

কাটামুণ্ডের ভয়ে ওপার হয় বা ছাগলহীন,
আর   এপারে হাঁস্‌ফাঁস্‌,
এপারের সব ছাগলগুলি ভাবছে নিশিদিন
কোথা   মিলবে এত ঘাস ?

উভয় পারের ছাগল মিলে চলছে গুঁতোগুঁতি,
বাধে   বিষম গণ্ডগোল ;
এমন সময় কাটামুণ্ড দিল প্রতিশ্রুতি
আর   খাইমু না ছাগল।

তাই না শুনে নানা মুনি দিলেন নানা মত
ওই   সম্ভব অসম্ভব,
কেউ বলে— বাঘ দীক্ষা নিয়ে ছেড়ে শাক্ত পথ
এবার   হইয়াছে বৈষ্ণব।

কেউ বা বলে বাঘের কথায় ক'রো না প্রত্যয়—
ভাই   দিচ্ছি মাথার কিরে ;
কেউ বা বলে এপারের ঘাস মোটেই মিষ্টি নয়
এবার   চল' গো সব ফিরে।

দোটানায় পড়িয়া সবাই করে হুড়োতাড়া
আহা   কত যে হয় ঘাম।
ফকির কহে— উভয় পারের যত হতচ্ছাড়া
ওরে   বারেক তোরা থাম।

ভাল ক'রে দ্যাখ রে চেয়ে কাটা মুণ্ডু ওটা,
ওতো   নয়কো আসল বাঘ,
আর নিজের পানে তাকা, তোরাও মানুষ গোটা গোটা,
নয় রে   কসাইখানার ছাগ।

এই বাঘছাগলের কথা যদি শুনে ভক্তিভরে
আর   শোনায় বন্ধুজনে
ধড়ে মুড়ে যোড়া লাগে দক্ষিণ রায়ের বরে
এক   পরম শুভক্ষণে।

আষাঢ় : ১৩৫৭

কবি নহি

আমার কবিতা হয়তো পড়নি কেহ,
পড়িলে কখনো বলিতে না মোরে কবি।
কবি যে হবে সে জেনো নিঃসন্দেহ
বাঙলায় বসে ভাবে না সাহারা গোবি।
চারিদিকে মোর শ্যামল গন্ধ-গীতি,
কত হাসিমুখ কত স্নেহ কত প্রীতি,
আলো-ছায়া, সুখ-দুখ,
সে-সবে আমার নেশা ধরিল না চোখে—
মন বসিল না প্রেমের অলকা-লোকে,
ভরিল না খালি বুক।

কবি নহি আমি, কবি নহি তথাকথিত,
যে ব্যথা জীবনে সব ছন্দের অতীত—
আমি, সে ব্যথায় চির-ব্যথিত।

কে আমার বুকে চিরতৃষা-জর্জর
চাহে শুধু দূর সুন্দর মরীচিকা?
বৃথা ডাকে তারে বাপী কূপ সরোবর
অন্তরে জ্বলে অনির্বাপ্য শিখা।
সে শিখা টলে না দুঃখের কালো ঝড়ে,
তর্জনী তুলি জ্বলে তা বাসরঘরে,
কে তারে বুঝিবে বলো?
সূর্যের মত নির্বাক আহ্বানে
শিশির-কণায় কহে সে যে কানে কানে—
আমি জ্বলি তুমি জ্বলো।

কবি নহি আমি, কবি নহি তথাপ্রথিত
অনাসৃষ্টির ঘনমন্থনে মথিত
আমি, অনাদি ব্যথায় ব্যথিত।

জানি না সে ব্যথা কবে হবে কোথা শেষ,
শুধু জানি—আমি ধরেছি নিরুদ্দেশ
মৃত্যুর ছায়াপথ,
বধির বিধাতা যেথা অনলাক্ষরে
লিখিয়া চলেছে তিমির-ললাট 'পরে
মানুষের দাসখত।

কবি নহি আমি, করিনি ছন্দে গ্রথিত
যে বিধি-বিধান প্রতিবিধানের অতীত;
আমি মহাবন্ধনে ব্যথিত।

পৌষ : ১৩৫৭

ছড়া

থুত্থুর থুত্থুর থুত্থুর থুড়ি,
শাক-ওয়ালী তিনকেলে বুড়ি।
কম্‌লা দীঘির জংলা পাড়
হুমড়ে টানছে কলমির ঝাড়।

শুশুনি কলমি ল’ ল’ করে
বুড়ির মাথায় ঝুড়ির পরে।
ঝুড়ির নিচেয় কাঁপছে ঘাড়—
শীতের হাওয়ায় কচুর ঝাড়।

পদ্মের পত্রে ছল ছল জল
দলমল দলমল কলমির দল।
চলছে তিনকাল পা পা হাঁটি
বোঝার উপরি শাকের-আঁটি।

কাঁপছে কণ্ঠ উঠছে ডাক—
নাও মা শুশুনি কলমির শাক।
শুশুনি কলমি ল’ ল’ করে
নামিয়ে নাও মা ঘরে ঘরে।

হাঁকছে তিনকাল শুনছে কে ?
কানছে এককাল মুখ ঢেকে।
বলছে চলছে গুটি গুটি—
নাও মা নাও মা দাও মা ছুটি॥

ক্যাক্‌টাস্‌

দিনযাপনের উদয়ে অস্তে
লবণের পারাবার,
তারি তীরে খাসমহালি মরুতে
ক্যাক্‌টাস্‌ ঝাড়ে ঝাড়।

সারি সারি সারি মরণ-পথিক
শরণার্থীর তাঁবু,
বালিবদলের ব্যাধিবিবর্ণ
কাঁটাসার যত কাবু।

জাহাজ ডুবিতে দম ফেটে মরা
নাবিকের পরিহাস,
শ্মশানবন্ধু অক্টোপাসের
কঙ্কাল ক্যাক্‌টাস্‌।

গর্তে গর্তে দ্রুত গতাগতি
দাঁড়াসার কাঁকড়ায়
কণ্টক-প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে
ক্যাক্‌টাস্‌ আঁকড়ায়।

কোন স্বপনের খণ্ড ছিন্ন
স্মরণের ইতিহাস
বালুর ঢালুতে শুষ্ক তালুতে
গুঞ্জরে ক্যাক্‌টাস্‌।

রৌদ্রোজ্জ্বল দিগ্‌-অরণ্যে
নীল পাহাড়ের ধূমে,
জ্বলিছে জীবন অভ্র ভেদিয়া
দেবদারু ক্রমে ক্রমে।

তরঙ্গভাঙা দ্বীপান্তরের
নারিকেল চূড়ে চূড়ে
মৃত্যুঞ্জয়ী দুঃসাহসের
বিজয়কেতন উড়ে।

দূরের সে সমাচার তো কখনো
পায় না বামন ঝাড় ;
দিনযাপনের চতুঃসীমায়
উই-পাহাড়ের সার।

শিলামন্দিরে জগন্নাথের
সরাচাপা সন্ন্যাস,
মরুসাগরের বালুকাতীর্থে
তীরস্থ ক্যাক্‌টাস্।

বোশেখী ছড়া

গাঁ'র শেষে পথ শেষ, ভোলা-মাঠ সুরু।
কচি অশথের পাতা কাঁপে ঝুরু ঝুরু॥
ঝুরু ঝুরু কাঁপে পাতা উড়ু উড়ু মন।
ঠিক দুপুরের কোলে দোলে শরবন॥
শরবনে বীণ্ বাজে সরস্বতীর।
মাটির ঘোড়ায় মাঠে ছুটে চলে পীর॥
ঝিন্ ঝিন্ করে দিন প্রাণ আইঢাই।
ঢ্যালাবন খুঁজে দুটো তরমুজ খাই॥
চোখ বুঁজে তরমুজে শুনি কিচ্‌মিচ্।
কেটে দেখি গুচ্ছের উচ্ছের বীচ॥

একখুঁটো তালগাছে বাবুইএর হাট।
রোদে পুড়ে হাটুরের গলা হ'ল কাঠ॥
যদ্দূর যায় তারা খায় রদ্দুর।
সাঁই-এর দীঘি সে বলো আছে কদ্দুর॥
দীঘল দীঘিতে জল কানায় কানায়।
রাঙা মেয়ে কাঁদে একা ঘাটের রাণায়॥
রাঙা মেয়ে কাঁদে কেন কাঁদে চাঁপা মেয়ে
বকুলের তলা কেন ফুলে যায় ছেয়ে॥
চাঁপা গাছে চাঁপা ফুল কেবা দেয় পেড়ে।
কচু পাতা ভাবিছে তা ঘাড় নেড়ে নেড়ে॥
বুনো কচু খেয়ে বুড়ী ভাঙে গোটানাল।
মটামট্ ভাঙে বুড়ো তেঁতুলের ডাল॥

পাহাড়ে মাছির চাক তেঁতুলের ডালে।
পেয়ে নাড়া বসে তারা দাড়িভরা গালে॥
মৌচাকে পাকাদাড়ি কাঁচা হ'য়ে ওঠে।
টপ্‌টপ্ মধু ঝরে বুড়ো যত ছোটে॥

কাঞ্চন থালে মধু উপচিয়া পড়ে।
একফোঁটা খেয়ে প্রাণ আনচান করে॥
এগাঁ থেকে ওগাঁ যাই আন্‌চান্‌ প্রাণ।
মাঠের হাওয়ায় লাগে পাহাড়ের টান॥
পাহাড়ে পাহারা দেয় নীল পর্বত।
ঝর্‌নায় ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরে সর্‌বত॥

যত সর্‌বৎ খায় পাহারাওয়ালা।
তাই দেখে রেগে খুন উম্‌নো গোয়ালা॥
উম্‌নো গোয়ালা রেগে ঘুঁষ দিল ভুসি।
ঘুঁষ খেয়ে খুসি হয়ে মেরে দিল ঘুঁসি॥
ধুম্‌মো পাহারোয়াল উম্‌শো গোয়াল।
ঘুঁসোঘুঁসি ভাঙে তারা এ ওর চোয়াল॥
একটা চোয়াল নিল বোয়ালের পোয়।
আরেকটা কইমাছে তালগাছে থোয়॥
তালদীঘি ঢলঢল কলমীর দল্‌।
পদ্মপত্রে জল করে টলটল॥
পদ্মের পাতে খোকা খেলে শুয়ে শুয়ে।
টলটল ফটিকের ফোঁটা টলে ফুঁয়ে॥

নীল ঘেরাটোপে ঘেরা মস্ত খাঁচায়।
রঙবেরঙের পাখী কেবলি চ্যাঁচায়॥
ভোমরায় গোমরায় গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌।
ঘোলাজলে কোলা ব্যাঙ ডালে ছ্যায় নুন॥
সেই যে গিয়েছে বেঙী গঙ্গাস্নানে।
আজও তো এল না ফিরে কি হ'ল কে জানে॥
ইন্দ্রের রথ নামে গঙ্গার তীরে।
সুন্দুরী দেখে চুরি করে কি বেঙীরে॥
ভেউ ভেউ কাঁদে ভেক কোথারে ভেকী।
মনের হুতোশে শেষে ভেখ্‌ নিলে কি॥

ডুবে ডুবে ডোবাটার নাহি পায় তল।
আকালের গাছে ঝোলে মাকালের ফল॥
বক্সি বাগানে খালি নিকিড়ির কুঁড়ে।
মরেছে নিকিড়ি খুড়ো পেটে মাথা ঘুঁড়ে॥
শ্যাওড়ার ঝোপে ওকি রয়েছে বেঁকে।
পাঁদারে মাদার গাছে পা ঝুলিয়ে কে॥
কেলে হাঁড়ি গাদা হ'ল আকাশের কোণে॥
ছুট্ ছুট ছুটে ঘরে দুটি ভাইবোনে॥
পিছনে ছুটেছে ঝড় ধর্ ধর্ ধর্।
অশথের কচি পাতা থর থর থর॥
ছুটে কোলে উঠে মার আঁচলের নিধি।
হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে ভয় কি রে দিদি॥

বৃক্ষরোপণ

বৃক্ষবর্গ ব্যাকরণে পুরুষ ব'লে গণ্য,
পাড়াগাঁয়ের মানুষ তারা স্বভাব স্বতই বন্য।
রোপণ যদি কর তাদের অপ্সরাদের নৃত্যে
ছায়া দেবে ফল ফলাবে—সে সব আশা মিথ্যে

সাধ্‌ সাবধান,—
গাছ পুঁততে কোদাল লাগে,
লাগে না নাচ গান

চাষাভুষো অবাক হ'য়ে
ভাবছে—এ কি ব্যাপার!
স্বাধীন যত বাবুদের আর—
বিলম্ব নেই ক্ষ্যাপার।

আষাঢ় : ১৩৫৭

অবসর

কর্ম-স্পর্শহীন
অমলিন অতি দীর্ঘ দিন
অব্যাঘাত নিদ্রাভরা রাত
আসন্ধ্যা প্রভাত।
প্রত্যহের উপর প্রত্যহ
গড়াইয়া গড়িছে সপ্তাহ।

মাস সংবৎসর
বিস্তীর্ণ ধূসর অবসর
যত নির্ভাবনা ভাবিবার
বহু আকাঙ্ক্ষিত
(আবৈতরণী রবিবার)
কর্মান্তিক এ বিশ্রাম
জীবন্তে দিতেছে মোরে
ভীতিহীন মৃত্যুর আরাম

আষাঢ় : ১৩৫৭

ভয় কি ?

বরাবর মোরা আসছি দেখে
পালায় যাহারা প্রথমে ঠেকে
শেষটা তারাই লড়াই জেতে
বিধাতা তাদের স্ব-পক্ষেতে।
দু'দু'বার দেখ ব্রিটিশ্ লায়ন্
উর্ধ্বশ্বাসে সে কী পলায়ন!
প্রথম পালাল 'মন্সে' হেরে
হ্যাঁথা ক্যাঁথা যত সকলি ছেড়ে।
দু'বারের বার ডন্কার্কে
ডোবরে উঠিল ডুব মার্‌কে।
শেষটা কিন্তু জিতল সেই,
জার্মানদের পাত্তা নেই।
রুশ ভল্লুকও খায়নি কম
কভু উত্তম কভু মধ্যম,—
ফাটায়ে গগন আর্তনাদে
ওয়ার্স' হ'তে স্তালিনগ্রাদে।
সেই রুশিয়ার ভয়েতে আজ
বিশ্ব পরিছে যুদ্ধসাজ।

সশস্ত্র যদি পালানো চলে
নিরস্ত্রে ভীরু কে তবে বলে ?
আঁধার রাত্রে ভূতের ভয়
মানুষ মাত্রে সবারই হয়।
প্রভাতে যখন সূর্য উঠে
ভূত প্রেত সব পালায় ছুটে।
নিঠুর মূঢ় অত্যাচারী
প্রথম জিৎ তো হবেই তারই।

বিধির বজ্র দেরিতে নামে
তখন তাদের নাচন থামে।
অতএব কোন চিন্তা নেই,
লড়াই থামে না পলায়নেই।
দুধে ভাতে নেতা আছেন বহু,
তাঁদের চরণে প্রণাম রহু।
আঁক ক'ষে তাঁরা দেখান ভয়
মেনে নিতে হবে এ পরাজয়।

জীবন-মরণ—সন্ধিক্ষণে
কত কথা আজ পড়ে যে মনে।
বাংলায় আর নাই কি কেউ
লাগামে ফেরাবে প্রলয় ঢেউ ?
সে তরঙ্গের ধরিয়া ঝুঁটি
ঝঞ্ঝার সাথে চলিবে ছুটি !

না থাকে না থাক, কিসের ভয় ?
হবে হবে হবে মোদেরি জয়।
আবার আমরা ফিরব দেশ,
হব না হব না নিরুদ্দেশ।
ঝুলির ভিক্ষা ঝুলিতে থাক,
পেয়েছি সত্য ক্ষুধার ডাক।
পশ্চিম পারে না পেয়ে খেতে
পূবে ফিরে যাব ক্ষুধায় তেতে।
তখন মোদের রুখবে কে ?,
ঘরে খিল্ দেবে ভাব দেখে।
ম্যয় ভুখা হুঁ—ক্ষুধার ঝণ্ডা
তুলে, বুঝে নেব আপন গণ্ডা।

শ্রাবণ ঃ ১৩৫৭

শীতের কমল

শীতের কমলসম
এবার শুকাল মম
চিত্তের প্রকাশ
আজ শুধু অশ্রুজলে
মগ্ন আছি পঙ্কতলে
পঙ্কজের ধ্যানে

কে জানে আবার কবে
আপন গৌরবে হবে
মৃণাল বিন্যাস
শ্যামপত্রে—ঢাকি জল
বিকশিবে শতদল
বর্ণে গন্ধে গানে
নভশ্চর সূর্যের সন্ধানে।

সে প্রভাত লাগি
পঙ্কমাঝে অন্ধ নিশা জাগি।

অগ্রহায়ণ : ১৩৫৭

স্বাধীনতার সূর্য

কাঁপিতেছিস আশার বাতি
পোহাবে কি এ দুঃখরাতি ?
সহসা বায়ু বেণুর বনে
বাজায়ে গেল তূর্য,—
জাগো গো জাগো দুয়ার খোলো,
তিমির নিশা প্রভাত হ'ল,
পূরব-ভালে উদিল ওগো
স্বাধীন নব সূর্য।

চমকি মোরা বাহিরে আসি,
দেখি যে— ধরা যেতেছে ভাসি,
শ্রাবণ-ঘন-বাদল রাতি
পোহাস কি না কে জানে
কোথা বা নব কিরণ-ছটা,
মেঘের বুকে মেঘেরি ঘটা,
অন্ধকার দ্বিগুণ কালো
হয় কি কভু বিহানে ?

সিক্ত শাখি-শাখায় থাকি'
ডাকিয়া কহে ভোরের পাখী—
আমরা জানি আমরা জানি
নবীন রবি উঠেছে।
বাদল-ঝরা মেঘের পারে
তিমির-হরা কিরণ-ধারে
অকূল দুঃস্বপ্নভরা
আঁধার রাতি টুটেছে।

জয়তু জয় বিবস্বান,
নমো হে নম জগৎ-প্রাণ,
শ্রাবণ-মেঘ তোমারি দান
সে কথা মোরা বুঝেছি।
অরুণ তুমি কবির গানে
পূষণ তুমি ঋষির ধ্যানে
তোমারে নিতি নূতন নামে
অনাদি কাল খুঁজেছি।

উদিলে যদি, প্রকাশ হও,
মেঘের গ্লানি কেন গো সও,
হে স্বাধীনতা, হে অভিনব
স্বয়ম্প্রভ সূর্য!
তোমারি তেজ বহিতে দাও,
তোমারি আলো সহিতে দাও,
কণ্ঠে আজি উঠুক বাজি
তোমারি জয়তূর্য।

শ্রাবণ : ১৩৫৭

হাটের কবি

হাটে হাটে আজ ঘুরে যে বেড়াই
সে শুধু করিতে হাট,
চাল ডাল নুন তরি-তরকারী,—
সহস্র ঝঞ্ঝাট !

সেদিন আমার গিয়েছে বন্ধু
যেদিন যেতাম হাটে,
শুনিবারে শাক-সব্জীর মুখে
কি ব্যথা জমেছে মাঠে।

রসালের গালে অশ্রু হেরিয়া
পড়িত দীর্ঘশ্বাস,
কিস্‌মিস্‌ কেঁদে শুনাত দ্রাক্ষা-
কুঞ্জের ইতিহাস।

গিয়েছে সে সব দিন,—
যে বুক মূকেরে করিত মুখর
সে আজি দরদহীন।

গেছে যৌবন নাই অর্জন
করি নাই সঞ্চয়,
তাই আজ ভাই পাই-পয়সাটি
করি না অপব্যয়।

হাটে গিয়ে আর মেলে না আমার
দরদীর সাক্ষাৎ,
উদর ভরিতে সওদা করিতে
আজি মোর যাতায়াত।

চলি থলি হাতে ভাঙা ছাতি মাথে
পুরাতন সেই হাটে,
অতি সাবধানে পরাণ-অধিক
পয়সা গুঁজিয়া গাঁঠে।

কোথা কোন্ বুড়ী বেগুনের ঝুড়ি
বেচে কিছু সস্তায়,
ইষ্টকাদপি দৃঢ় বাঁধাকপি
আছে কোন্ গাদাটায়,

ইত্যাদি বহু, কত আর কহু?
করি যা ইতরপনা।
দেখিছ বন্ধু হাটের কবির
ললাটের লাঞ্ছনা?

এ দুঃখ সহা এই থলি বহা
জানি অলঙ্ঘনীয়,
যে দুখের তার সহে না কো আর
তোমারে কহি গো প্রিয়।

হাতে কাঁটা ফুটে নধর বেগুন
ঝাঁকা ঘুঁটে বেছে আনা,—
ভাঁড়ারের বঁটি কুটিয়া দেখায়
দুজনেই মোরা কানা।

কান্‌কো পরখি টিপে টুপে শুঁকি'
টাট্‌কা যে মাছ কিনি,
রাঁধুনীর তাওয়া ছুঁতে নাহি ছুঁতে
পচা ব'লে তারে চিনি।

আরও সুকঠোর দুর্ভোগ মোর
কিছু দিন হ'তে দেখি,
চেনা দোকানের ভাঙানো রেজ্‌কি!
মোকামে আসিয়া মেকি!

যত কানা কুঁজো ভুয়ো শুঁয়োধরা
হাট-ঝাঁট-দেওয়া মাল
আমি নাকি ভাই খুঁজে খুঁজে তাই
কিনে আনি আজকাল।

সে দোষ যে মোর থলির, বন্ধু,
সে কথা বলি বা কারে?
চোখের চশ্‌মা কপালের ঘাম
মিছে মুছি বারে বারে।

হেন বদনাম অপকলঙ্ক
ঘটিত না মোর আগে,
পথের ধূলাও হ'ত স্বর্ণাভ
এ হাতেরই অনুরাগে।

তুষিতে আমায় গভীর অমায়
ফুটিত চাঁদের হাসি,
পাশে আসি কাঁদি শাওনের মেঘ
ক্ষুধিত অশ্রুরাশি।

সে সৌভাগ্য গিয়েছে, যাক্ গে
নাহি ক্ষোভ অন্তরে,
হাটের ফেরতা থলি যেন কেউ
নামায় দরদভরে।

যা ক'রেই হোক্ সহিব বন্ধু
হাটের প্রবঞ্চনা,
ঘরে ফিরে যদি নাহি ঘটে ভালে
ততোধিক লাঞ্ছনা।

অগ্রহায়ণ : ১৩৫৭

দুবেলা দুমুঠো

দুবেলা দুমুঠো পেটে খেয়ে শুধু বেঁচে থাকা।
বাঁচার বাহিরে,—
অস্তসূর্য অপরাহ্নিক ধূম্র আকাশ
অনাদ্যন্ত ধূ ধূ ফাঁকা।

হে বন্ধু, কহ কোন পথে মোর
এ দুঃশান্তি পথিক হবে?
এ ঔদাস্য এ নৈরাশ্য এ অতৃপ্যতা
বাণী পাবে বল' কোথায় কবে?
অমারজনীর অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
তারায় তারায় নিমেষপাতের ছন্দে ছন্দে
দৈন বিধবা নিশিগন্ধার
নবজাগরণে সসৌরভে?
অথবা,—ক্লান্ত সুষুপ্ত সব দুঃখহরণ
মহামরণের অবলুপ্তির অগৌরবে?
কোথায় কবে?

অষ্টপ্রহর—অবিশ্রান্ত মরিছে খেটে
দুবেলা দুমুঠো কদন্ন তবু জুটে না পেটে,
জানি জানি আমি জানি
নিদ্রাহারা সে মহাশূদ্রের
রুদ্র ক্ষুধার বাণী।

কিন্তু বন্ধু,—
ঘোলা জলে নেমে পানা ঠেলে নিতি
'ওঁ গঙ্গেতি' প্রাতঃস্নান,
বিগতস্পৃহ পাকস্থলীতে
যেন তেন দুটো অন্নদান,
ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বেঁধে ব'য়ে মরা
চোরাই রত্ন দীপ্তিমান!

নাহি জানি নাহি জানি
এই জীবনের বাণী।

চৈত্র : ১৩৫৭

জন্মদিন

মেঘের আড়ালে আষাঢ় দিবস চুপি চুপি চ'লে যায়,
অপরিচিতের মতন এবারও বিদায় দিবি কি তায় ?
আবাহন-হীন এ আষাঢ় দিন বারে বারে গেছে চলি',
নয়নধারায় করিয়া সিক্ত কোন কথাটি না বলি'।
এবার সাধিয়া শুধাও তাহারে কি চাহে সে বলিবারে,
জীবনে যাহারে করনি স্মরণ বরণ করহ তারে।
তারি বক্ষের সজল শ্বাসে ভরি' লহ তব বুক,
এই দিনটির দর্পণে দেখ সারাজীবনের মুখ।

আজিকার কালো, রবি শশাঙ্কে হয়নি কলঙ্কিত,
কাল সাগরের কৃষ্ণকমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত।
ঢল ঢল তার নির্মল শোভা সনির্বন্ধে ডাকে,
তারি গন্ধের মেদুর ছন্দে সজল গগন ঢাকে।
তারি বুকে নেমে আলোকের পাখা হ'ল গুঞ্জনহীন,
মর্মর কোষে তপন তারকা—তারি মধুপানে লীন।
চির কলঙ্কী ওরে কবি তোর কি সৌভাগ্য বল্—
এই দিনটির মৃণালে ফুটিল হেন সহস্রদল।

পেরেছিস্ কিরে চিন্‌তে ?
মরণকমল ফুটে আছে ওই জন্মদিনের বৃন্তে।
চেয়ে থাক্ চেয়ে থাক্,
বন্দনাহীন অর্ঘ্যবিহীন নিশ্চল নির্বাক।

১৩ই আষাঢ় : ১৩৫৮

টুকরো

ফুল কহে ফুকারিয়া, ফল, ওরে ফল,
কতদূরে র’য়েছিস্ বল্, মোরে বল্ ।
ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি—
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি ।
শুনে হাসে ঝিঙাফুল, কুমড়ো, বেগুন ;
যুঁই, বেলি ভাবে এযে কাটা ঘায়ে নুন !
অফলা ফুলের মালা দুলাইয়া গলে
মিছে আশা দেয় কবি সব ফুলই ফলে ।
মুখর গোলাপ কহে—‘কবি মহাশয়,
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা তব যোগ্য নয়’ ।
বেদনার প্রতিকার যদি নাহি পাও,
যে ব্যথা গভীর তারে ফুকারিতে দাও ।

ভাদ্র : ১৩৫৬

⁂

নব বৈশাখে দূর তালীশাখে
বাঁকা চাঁদখানি দুলে,
নব মিলনের সঙ্কেতদীপ
অন্ধকারের কূলে ।

বৈশাখ : ১৩৫৭

⁂

উদরে যার অন্ন নাই
কটিতে নাই বস্ত্র,
বাহুতে যার বহিতে নাই
প্রাণ বাঁচানো অস্ত্র,
স্বাধীন হোক অধীন হোক
কি তার তাহে আসে যায় ?
স্বাধীনতা তো মাদুলি নহে
গলায় বেঁধে ধুয়ে খায় ।

শ্রাবণ : ১৩৫৭

অন্ন দাও মোদের মুখে
কটিতে দাও বস্ত্র,
হে স্বাধীনতা, বাহুতে দাও
প্রাণ বাঁচানো অস্ত্র।
হাসিয়া কহে স্বাধীনতা,—
মোর তো ভাই দোকান নাই,
ওসব আমি পাব কোথা ?
হাতে ও পায়ে শিকল ছিল
দিয়েছি খুলে তাই,
বাঁচিতে চাহ বাঁচিতে পার,
মরিতে বাধা নাই।

শ্রাবণ : ১৩৫৭

*
* *

উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার
যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার ;
কাঠ কাটে বস্ত্র কাটে কাটে সমুদয়
সুন্দর সুন্দর দ্রব্য কেটে করে ক্ষয়।

উই আর ইঁদুর কহিছে জুড়ি কর,
এত বড় অপবাদ কেন দাও নর ?
কাটিতে পারি না হেন দ্রব্য আছে নানা,
মানুষের মাথা আর ছাগলের ছানা।
গাঁঠ-কাটা সিঁদকাটা এ সবও না জানি,
চরকা কাটার বস্তু রাখি না সন্ধানই।
দূরে রহ ঘটি বাটি লোহা ও পাষাণ,
কাটিতে শিখিনি আজও নিজ নাক কান

আষাঢ় : ১৩৫৮

প্রেম চুকে গেছে,
প্রেমিক প্রেমিকা মুখ বুজে ঘর করে ;
শুকায়েছে জল,
আবাদ চলেছে অচ্ছোদ সরোবরে ,
দেয়ালে ঝুলিছে
আর্শোলা-খাওয়া বেরঙা র‍্যাফেলী ছবি ;
কবিতা ছেড়েছে,
বৃদ্ধ বয়সে নাম জপ করে কবি।

আশ্বিন : ১৩৫৮

*
* *

উত্তীর্ণ হয়েছে সন্ধ্যা, অন্ধকার ঘিরে,
চলেছি লণ্ঠন হাতে বৈতরণী তীরে।
অবসন্ন ক্ষীণ দেহ, সরণি নিঝুম,
কম্পিত প্রাণের শিখা উদ্গারিছে ধূম।
পলিতা যতই ঠেলি বাড়াইতে আলো
কালিমাখা কাচ তত ছড়াইছে কালো।

সংকীর্ণ বন্ধুর পথ, বন্ধু কেহ নাই,
যত চলি তত অভিসম্পাত ছড়াই।
বাড়ে আঁধারের ধাঁধা, লণ্ঠনের ফাঁদে
অনাদি জ্বালায় মোর ব্যর্থশিখা কাঁদে।

মাঘ : ১৩৫৯

*
* *

ভগ্ন বাতায়ন পরে
হৃতশ্রী মুকুর করে বসেছি হেলিয়া,
মগ্ন আলো সন্ধ্যাকাশে
একুশে ফাল্গুন আসে রজনী মেলিয়া।

ফাল্গুন : ১৩৫৯

দীঘির ঢালু পাড়ে
জেলেরা জাল ঝাড়ে
চকিত মাছগুলি লাফায় খাবি খায় ;
ওপারে তালগাছে
চিলটি চেয়ে আছে,
চোখের উপরেতে 'দু'পর বয়ে যায়।

দীঘির-জল-ছাঁকা   জালের মাছ
চিলের-চেয়ে-থাকা   তালের গাছ।

ফাল্গুন : ১৩৫৯

এদিক—ওদিক

(এদিক)

জাগ জাগ দেশবাসিগণ!
শিয়রে শমন স্বয়ং করিছে
মহামারণের আয়োজন।
আরোহণ করি সরকারী মোষে
উপোসী চাষীর রক্ত সে শোষে,
ব্রেকফাষ্ট্ সেরে, মালকোঁচা ক'সে
তাই করি সবে আহ্বান,
ভুখারি ভিখারী হ'য়ে এক দিল্,
উঠাও আওয়াজ, সাজাও মিছিল,
আজ নয় কাল হবেই আকাল
ইন্‌ক্লাবী জয়গান।

ক্ষুধায় ক্ষুব্ধ বজ্রমুঠিতে
ধর ওর শিং চেপে
লাল ঝাণ্ডাটা উড়াও সামনে
মহিষটা যাক ক্ষেপে।
পিছনে পিটাও শত জয়ঢাক
আছাড়ে পটকা ছাড়,
নিড়েনি নরুণ ইঁট পাটকেল
যে যা পার ছুঁড়ে মার
কিছুদিন ধ'রে চলুক এমনি
শেষটা দেখিবে মজা,
যমপিঠে মোষ হবে দেশছাড়া
গুটায়ে ল্যাজের ধ্বজা।

তারপর, ভাই তারপর—
নূতন উষার রক্ত ছটায়
ভেসে যাবে সব ঘর পর।

খাটাখাটুনির ঘুচিবে বালাই,
দুর্ভিক্ষের মুখে দিয়ে ছাই
চারিধার খাসা রাতারাতি ভাই
ভরি যাবে ধনে ধান্যে।
দেশ নয় যেন শ্বশুরের ঘর ,
দুবেলা পোলাও ক্ষীর ননী সর,
ঢেকুর তুলিছ এ ওরে বলিছ—
দোক্তা নে ভাই পান নে।

(ওদিক)
ঘুমাও ঘুমাও দেশবাসী।
যে মিছে বলিছে কুচক্রীদল
উড়াও সে কথা উপহাসি'

ও নহে শমন মহিষারোহণে,
উনি গণদেব মূষিক বাহনে,
ওর আগমন তব প্রয়োজনে
মাভৈঃ মাভৈঃ ভাই ;
দুর্ভিক্ষের নিবারণ লাগি
কি দিন কি রাত রহিয়াছে জাগি,
আরও কি ফন্দী ফাঁদা হয়ে গেছে—
সেটা বুঝি দেখ নাই ?

মহাবটমূলে আটচালা তুলে
ঢেঁশকেল হ'ল গাঁথা,
ডজন হিসাবে বাবলাকাঠের
ঢেঁকিও হয়েছে পাতা।

বাবলাকাঠের ঢেঁকি সারে সার
জিউলি পোয়ার খাঁজে
লোহায় ধুলোয় শক্ত মুষল
ঘা পাড়ে গড়ের মাঝে।
ঢেঁকির এ মুখে জোড়াপায়ে মুখে
ঘন ঘন পাড় পড়ে,
ঢেঁকির ওমুখে ঢেঁকুশ ঢেঁকুশ
ধান ভানা হয় গড়ে।
খুশ খুশ খুশ উড়াইয়ে তুষ
কুলো-ঝাড়া চাল হয়,
ঢেঁশকেলে যার এতগুলো ঢেঁকি
আকালে কি তার ভয় ?

সব দুখে এই ঢেঁকিই জামিন,
ইহারই ভিতর ভরা ভিটামিন,
জমিদার প্রজা কুলী কি কামীন
ঢেঁকি সকলেরই মূলে,
আমাদের হেন ঢেঁকির মহিমা
ছিনু এতকাল ভুলে।
সে ভুল এবার সংশোধিবার
ব্যবস্থা সব ঠিক,
আরও কিছুকাল ঘুমাও তোমরা
রহিবে সকল দিক।

রাস্কেলী যত ধাপ্পাবাজীতে
বুঝমান যারা চাহে কি মজিতে ?
ওদের কথায় প্রত্যয় কেউ
ক'রো না একটি বর্ণ।
জান তো অকালে জেগে উঠে মূঢ়
মরিল কুম্ভকর্ণ।

শ্রাবণ ঃ ১৩৭২

আগমনী

পথশ্রান্ত নিঃস্ব জীবন
নমিয়া পড়েছে ক্লান্তিভারে,
সহসা হেরিনু গৌরী কন্যা
দুটি হাত পেতে দাঁড়াল দ্বারে।
আস্তে ব্যস্তে খুলি ভাণ্ডার
হাঁড়ি কুঁড়ি ভেঙে করি একাকার,
ওই করপুটে তুলিয়া দিবার
যোগ্য কোথাও পাই না কিছু;
বুঝি না ছলনা, কোন অপরাধে
মেয়ে হ'য়ে মাথা করাবে নিচু।

মৃদু মধু হাসি' শুধায় আমারে—
চিনিবারে তারে পেরেছি কিনা;
কহিনু,—চিনেছি, ছলনা করিতে
অন্নপূর্ণা অন্নহীনা।
নবধান্যের সৌরভময়
অঙ্গ ভরিয়া উঠে পরিচয়,
যাচ্ঞা দিয়ে তো ঢাকিবার নয়
করপদ্মের সুষমারাশি।
কহিনু, চিনেছি ছদ্মের মাঝে
শরৎ মেঘেতে চাঁদের হাসি।

কহিনু আবার—সীমন্তে তব
ওই অক্ষয় সিঁদুরসম,
শীর্ণ স্মৃতির সীমান্তে আঁকা
চিরদিন তুমি রয়েছ মম।

ভুলি নাই সেই স্নেহকলভাষ,
মেয়ের মাঝারে মায়ের আভাস
শতদলে আজি হয়েছে বিকাশ,
বিস্ময়ে তাই চাহিয়া আছি।
শিবের ঘরনী সবার জননী
দাঁড়াল দুয়ারে ভিক্ষা যাচি!

সহসা তিমিরে ডুবিল ধরণী
কোথায় লুকাল গৌরী মেয়ে!
চির অনশন লেলিহ রসনা
কে ও বিবসনা আসিছে ধেয়ে?
কার খড়্গের ক্ষুধা-খরধারে
লুটায় মুণ্ড কাতারে কাতারে
কার খর্পরে অনিবার ঝরে
শিবাশকুনির মহোৎসব?
অট্ট হাসিয়া কে আসে করালী
চরণে দলিয়া শিবের শব!

সাঁঝ তন্দ্রায় ক্লান্ত কবি
হেরিল এ কোন্ কুহক ছবি?

ভাদ্র : ১৩৫৯

ভোর হ'য়ে এল

ভোর হ'য়ে এল কবি তোর।
নীড়ছাড়া বনপাখী
করে দূরে ডাকাডাকি,
খোপে খোপে কাঁদে কবুতর।

জীবন-রজনী শেষে
দাঁড়ায়ে শিয়র দেশে,
মরণ-অরুণ ওই
চাহিয়া নির্নিমেষে;
তোরই ঘুম ভাঙাতে
তোরই পথ রাঙাতে
বাহিয়া তিমিরতরী এল সে।

যে-আলো নয়নাতীত
সেই আলো হাতে তার,
যে-বোঝা বহনাতীত
সেই বোঝা মাথে তার;
তোরই জ্বালা সহিতে
তোরই বোঝা বহিতে
আজি বুঝি অবসর পেল সে।

রবি শশী জ্বেলে জ্বেলে
এই যে রজনী-জাগা,
কেঁদে হেসে ভালবেসে
এই যত ভালোলাগা;
কোজাগরী অভিনয়—
আর নয় আর নয়
ঘুরিয়ে দে এ-দুয়ারে চাবি রে!

আজ আর ডাকিস্‌নে
ভক্তের ভগবানে,
সুখে দুখে মুখে বুকে
কোথায় সে সেই জানে;
এল যে-করুণাময়
আঁখিভরা বরাভয়,
নম’ সে অবশ্যম্ভাবীরে।

ওরে কবি, নবপ্রভাতে,
রবি শশী তারা-জ্বালা
রজনীর দীপমালা
নিভিছে অরুণ-প্রভা-তে।

চৈত্র : ১৩৫৯

পরাভব

এ যে মরণের ভ্রূকুটি-ভয়াল
মুখোস আঁটিয়া মুখে,
চির জীবনের বন্ধু আমার
দাঁড়াইলে পথ রুখে।
সতিমির সংকীর্ণ সরণি,
বলহীন আমি একা,—
ভীম ভৈরব বীরপুঙ্গব,
তাই কি মিলিল দেখা ?
আতঙ্কে আমি কাল-ঘাম ঘামি'
টলিয়া পড়িব পায়ে,
তখন তোমার পরশ-অমৃত
লাগিবে সে মৃত কায়ে।
জীবন থাকিতে বন্ধুর সাথে
দেখা বুঝি হ'তে নাই,
চির বুভুক্ষু তৃষিতু জনেরও
খাবি খাওয়া চাই-ই চাই !

তাই বুঝি হেরি আজ,—
আপাদমস্তে, নমোনমস্তে,
যুদ্ধং দেহি সাজ !

কোথায় লুকালে ফোটা মালতীর
পরিমল মনোহর ?
কোথায় শুকালে ঝরা বকুলের
অফুরান নির্ঝর ?
নবনীল নভে শ্যামরূপাভাস
কুহু-কণ্ঠের ধ্বনি ?
শিশিরে শিশিরে ঝরানো ছড়ানো
অশ্রু-পরশমণি ?

সকলি ঘুচায়ে দাঁড়ালে আমার
ভুবন আঁধার করি’,
বন্ধুর পাশে বন্ধু কি আসে
বিভীষিকা-রূপ ধরি’ ?
দীর্ঘ দুখের পশরা মাথায়
জরাভারে দেহ কাঁপে,
হে নওজোয়ান এখন এসেছ
শক্তির পরিমাপে !
পুরুষ হইয়া হেন কাপুরুষে
বন্দি বন্ধু বলি’
সে দুঃখে এই ভিজে ভস্মও
উঠিতে চাহে যে জ্বলি’ ।

জানি তা হবার নয়,—
এবারের সেই মুখোসধারীর
মায়াযুদ্ধেরই জয় ।

•

তবু যে যুঝেছি, আজও যুঝিতেছি
সেই মোর গৌরব ;
মানুষের মত মানুষেরই হয়
বারবার পরাভব ।

চৈত্র : ১৩৫৯

অন্ত

প্রে-মকো অন্ত নাহি পাই।
ত্রিকুড়ি ছাড়ায়ে এসে
দেখিতেছি দিনশেষে
যে দূরে সে ছিল আছে তাই।
কখনো ভেবেছি—ও তো
আমলকী করায়ত,
কখনো হেরেছি—মরীচিকা,
কভু ক্ষণপ্রভা-ভীতি
কভু বা ধ্রুবের সাথী,
কখনো সাঁজের দীপশিখা।

তাহারি আহ্বান পেয়ে,
তারি পানে চেয়ে চেয়ে;
কানে খাটো, চোখে ছানি আজ;
তারি ত্রিতাপের চাপে
মাজাভাঙা হাঁটু কাঁপে
কাঁধে ঘাঁটা, অপরূপ সাজ!

তারি শিখানোর শিখি'
মামুলি কবিতা লিখি'
টাকা সিকি করি রোজগার,
হালে না মিলিলে পানি
দুই-হাতে দাঁড় টানি,
তথাপি প্রেমের নাহি পার।

যে কাঁদন কাঁদিলাম,
যে সাধন সাধিলাম,
আঁচড় কাটেনি তার মুখে,
আমারি বেপথুমান
ঘসা বুকে ক্ষয়া প্রাণ
এলোমেলো চক্‌মকি ঠুকে।

নদীর ভাঙনে ভাঙা
ওপারে পলাশডাঙা
দুচোখ রাঙায় ফুলে ফুলে ;
চাহিয়া আকাশপানে
ভাবি,—শেষ কোনখানে ?
ভাঙে ঢেউ ললাটের কূলে।

অস্ত গেল ক্লান্ত রবি,
সহসা ভবিষ্য ছবি
আঁকিয়া দেখাল সন্ধ্যাকাশ,-
জরাজীর্ণ জড় আমি
কণ্টকশয়নে ঘামি
প্রেম করে কুলার বাতাস।

ভাদ্র—১৩৬০

পেট ও মাটি

এখন বুঝেছি ভাই,—
পেট ছাড়া আর পূজা করিবার
দুনিয়ায় কিছু নাই।

আপাদ-মস্ত সাড়ে-ত্রিহস্ত,
তারি মাঝে রাজে পেট,
তারি নির্দ্দেশে দেশে ও বিদেশে
বারবার মাথা হেঁট।
আঁধার অতীতে ঋক্‌বেদীয়ারা
তারি ধান্দায় হ'ল ঘরছাড়া,
হ'য়ে মরুপার গিরি কান্তার
ভাঙে 'খাইবার' গেট্।
বুদ্ধ শুদ্ধ,—পেয়ে বোধিমূলে
পরমান্নের প্লেট্।

তারি টানে ঢেঁকি চ'ড়ে
নারদ আকাশে ওড়ে,
ধান ভেনে ভেনে সারা ত্রিভুবনে
যত ঢেঁশকেল ঢোঁড়ে।
সত্য দ্বাপর ত্রেতা
যা কিছু ঘটিল যেথা
একটু ভাবিলে পষ্ট হইবে
পেটই ছিল তার নেতা।
যত সিঁদুর তা গণেশের পেটে
তিন যুগই লেপা হয়,
গলিতে গলিতে ঘটিছে কলিতে
তারি পুনরভিনয়।

যা কিছু রকম-ফের—
সে শুধু বিধাতা উলটিয়া পাতা
টানিছে নূতন জের।

পেটের খোরাক ঠিক পেতে হ'লে
চিরকাল চাষা চাই ;
পেটের স্থবাদে মানুষে মানুষে
সবই চাষতুতো ভাই।
তাই চারিদিকে চাষ ও চাষার
ঘন ঘন জয়রব,
তাই সংগ্রাম, তাই প্রস্তুতি,
তাই যত বিপ্লব।

বাদাড়ের বাঘ পাঁদারে কহিছে
শোন গো বিড়াল মাসি,
যে মাটি যেখানে আঁচড়াও তুমি
সে মাটি তোমারি দাসী।
ওরা সব কারা দেয় হাতনাড়া,
কি ওদের অধিকার ?
যে যেখানে চষে খুঁটি গেড়ে বসে
সে জমিন খাস তার।

হ'য়ে একজোট দাসীটারে সব
ভাগাভাগি করে নাও,
সহজে সে যদি না ভরায় পেট
নাড়ি ভুঁড়ি ছিঁড়ে খাও।
টিক্ টিক্ টিক্ যত টিকটিকি
বলে ঠিক ঠিক ঠিক,
চোখ গেল চোখ গেল রব তুলে
চ্যাঁচায় চতুর্দিক।

শুধু, চার যুগ মড়ার মতন
বোবা মাটি আছে প'ড়ে,
যে যেমন খুশি চষে চোষে শোষে
কাটে ঘাটে ঝাড়ে ফোঁড়ে।
সর্বহরণ এ উৎপীড়ন
হবে না সহনাতীত ?
সব জীবনের উৎস হ'য়েও
সত্যই সে কি মৃত ?

মুড়ির দণ্ডে মানুষ চাহে যে
প্রতি পেট হবে ভুঁড়ি,
তারি যোগান কি দেবে চিরকাল
হাবা কালা এই বুড়ি ?
কোন দিন সে কি স্রষ্টার কাছে
দাঁড়াবে না জুড়ি' কর—
"আর কত কাল বহিব ঠাকুর
মানব-দানব-ভর ?"

অগ্রহায়ণ : ১৩৬০

আসছে জন্মে

রোড়াবাঁধে খোলা বারান্দায়
শীতের সূর্য গড়ায়ে যায়।

পড়ন্ত রোদে পথের প্রান্তে
অশথের পাতা কাঁপছে,
কি শীত গ্রীষ্ম কেঁপেই আসছে তারা ;
বলি-বন্ধুর অশথের গুঁড়ি
একঠাঁয়ে খাড়া ভাবছে,
কি শীত গ্রীষ্ম সে শুধু ভেবেই সারা
একশ বছুরে উদ্ভট যত ভাবনা।
পড়ন্ত রোদে পিঠ পেতে শুয়ে
দুধোলো গাভীটি জাওরায়,
তন্দ্রিত চোখে ঠাওরায়—
সারা গোজন্মে কোথায় কিসের ভাবনা ?
চোয়ালে জাবর, গোয়ালে ফিরেই
কোঁয়ালে বাছুর ও জাবনা।

একই ঠাঁয়ে খাড়া একশ বছর দাঁড়ায়ে
অচল অশথগুঁড়ি
আঁধারের তলে অন্ধের প্রায়
শিকড়ে শিকড়ে রস হাতড়ায়,
করে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি।
একই ঠাঁয়ে খাড়া চিরনিদ্‌হারা
উর্ধ্বে আকাশ ফুঁড়ি'
পাতায় পাতায় আলো আঁকড়ায়,
শাখায় শাখায় পাখা ঝাপ্‌টায়,
ঝড়ে ঝড়ে মোড়ামুড়ি।
চিরচঞ্চল পায়ে-শৃঙ্খল
অচল অশথগুঁড়ি !

সদ্‌গোপেদের দুধোলো গাইটি ভালো,
নধর চিকন কালো ;
অচল নয় সে চ'রে খেতে পারে,
লেজের বাড়িতে ডাঁশ মশা মারে,
ভুলেও ভাবে না দুষ্প্রাপ্যের ভাবনা :
অতীব সরল হিসাব তাহার
দুধের বদলে জাবনা।
উপরন্তু সে জাবর কাটে
পড়ন্ত রোদে ভরা পেট পেতে
ঢুলু ঢুলু আঁখি শীতের মাঠে।
গলার দড়াটা মাঝে মাঝে খোলা পায়,
তারি আনন্দে ঘন-রোমাঞ্চ-কায়।

এবারের মতো মনিষ্যি হ'য়ে
পুণ্যের ঘরে শূন্য ;
সব কথা যদি খুলে বলি তবে
শত্রু হাসিবে
বন্ধুরা হবে ক্ষুণ্ণ।
সুতরাং সব চেপেই যাই,
রোঢ়াবাঁধে এসে বন্ধুবরের খবর নাই।
সে যে ছিল মোর সর্বযামী,
দেখা পেলে তারে জিজ্ঞাসিতাম
আসছে জন্মে কি হব আমি ?
জানায়ে দিতাম আমারও দাবি—
পথের প্রান্তে অশথগাছ, না
সদ্‌গোপেদের দুধোলো গাভী ?

আমার মতন মনিষ্যিদের
খোলা আছে দুটি ভবিষ্যৎ,
হয় গোজন্ম নয় অশথ।

মাঘ : ১৩৬০

মোহিতলাল

দেশলাই ঠুকে কেরোসিন ঘুঁটে
কয়লার যোগাযোগে—
যে আগুন জ্বলে উনোনে উনোনে
মোদের অন্নভোগে,
যা ফুটায় নিতি আফিসের ভাত
বার্লি ও সাগুদানা,
মৃদু আঁচে আঁচে দালদা পেঁয়াজে
বানায় মোদের খানা ;
উদরপোষণ সে পোষা আগুন
ঘরে ঘরে মোরা চিনি।
রসনা-রসন তারি রসায়ন
মোড়ে মোড়ে মোরা কিনি।
যে আগুন জ্বলে যজ্ঞকুণ্ডে
অরণি-সমুত্থিত
হবি ও সমিধে কভু প্রোজ্জ্বল
কখনো বা ধূমায়িত,
যার রসনায় অশনি—শাণিত
দৃপ্ত শিখার জ্বালা,
যার ধূমজালে গগনের ভালে
ছেয়ে আসে মেঘমালা।
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু যম যার
প্রসাদ কামনা করে,
স্বর্গশাসন সেই হুতাশন
কদাচিৎ চোখে পড়ে।
নিবিয়া গিয়াছে সারা বাংলার
সেই হুতাশন কবি,
পড়িয়া রহিল হোমের ভস্ম
আহুত সমিধ্ হবি।

ভাদ্র : ১৩৫৯

কবিবন্ধু কালিদাসের প্রতি

আমারও ডাক পড়েছে আজি তোমার অভিনন্দনে,
বুঝিছ সখা, প'ড়েছি তাহে কেমনই খইয়ে-বন্ধনে।
তোমার মানা না মেনে যারা
তোমারে টেনে ক'রেছে খাড়া
বনের পাখী খাঁচায় রাখি' সাজাতে স্রক্-চন্দনে,
তাদেরই দলে কর্মফলে পড়িনু খইয়ে-বন্ধনে।

তুমি যে জান, ভালই জান, আমিও জানি কি এর দাম'
এ কলিযুগে কেন যে বড় হরির চেয়ে হরির নাম।
তোমারে ভালবাসে গো যারা
বেশী কি ভালবাসিবে তারা ?
মুফতে-সারা রসিকজন কিনিবে বই দিয়ে কি দাম ?
মজা মারারা মারিবে মজা, শ্রদ্ধাহীন সিদ্ধকাম।

খ্যাতির পথে খাতির পেতে বন্ধু জানি এ পথ নয়,
জীবনে হয় যে লালায়িত করে না সে তো মৃত্যু জয়।
তবুও তব ভক্ত মোরা
অর্ঘ্য হানি কাগজ ছোড়া,
কবির ভালে যা হয় হোক, ভক্তি যেন তৃপ্ত হয়।
কথার হাওয়া লাগায়ে পালে যুগের খেয়া হজুগে বয়।

যে নাম ধরি তোমারে ডাকি মিত্রতার অহংকারে
বিনা পালে ও বিনা লগিতে সে নাম চলে যুগের পারে।
সে কথা যদি নীরবে স্মরি'
কবিরে ছেড়ে কাব্য পড়ি
এড়ায়ে যেতে পারি গো সখা জীবনে বহু লাঞ্ছনারে।
কবিও যদি কাঙাল হয় মানুষ যাবে কাহার দ্বারে ?

তবুও আমি বন্ধু আজ তোমার নামে কবিতা বাঁধি,
ক্ষম গো ক্ষম প্রলাপ মম পরস্পর-বিসংবাদী।
　　　　জানি গো তব মহৎ চিত
　　　　এ-সবে কত সংকুচিত,
স্তবের বাণী সময়োচিত জুটে না, মিছে ছন্দ ছাঁদি।
দেশের দশা, কবির দশা কাঁদায় তোমা, আমিও কাঁদি।

---

* কথাসাহিত্য, চৈত্র ১৩৫৭ : কবি কালিদাস রায়ের সংবর্ধনা-সংখ্যার জন্য লিখিত·

মিতা কবি যতীন্দ্রমোহন

অনেক বন্ধু এসেছে, বন্ধু, তব অভিনন্দনে,—
তোমার গানের আনন্দ শুধু জাগিছে সবার মনে।
গানের আড়ালে প্রাণের তন্ত্রী যে ব্যথার টানে কাঁপে,
এ হতভাগ্য নিবিড় গভীর সেই বেদনাই মাপে।
তব সঙ্গীত সার্থক হ'ল যাদের বেদনা গাহি',
তোমার তরনী পৌঁছিছে তীরে যাদের অশ্রু বাহি',
এই আনন্দ দিনে
চেয়েছিল তারা অনিমন্ত্রিত আসিবে পন্থা চিনে।
নিষেধ ক'রেছি, কেহ বা শুনেছে, কেহ তাহা শুনে নাই,
তাদের হইয়া, বন্ধু, তোমার মার্জনা আমি চাই।

কাঁটাবন হ'তে ব'লে পাঠায়েছে তোমার সাধের কেয়া,—
'বন্ধুরে ব'লো, মোর শিরে আজও সমান ঝরিছে দেয়া।
কত কবি এল, কত কবি গেল, নিল অভিনন্দন,—
কেয়ার অঙ্গে নিবিড় হ'ল যে কণ্টক-বন্ধন!
আজও পাঠালাম বাদল বাতাসে গন্ধের উপহার,
আনন্দ-দিনে কেয়ার কথা সে স্মরে যেন একবার।'

তোমার পথের ঝরা শেফালীরা এসেছিল আজ ভোরে;
বেলা হ'ল যেই, মলিন মাধুরী আরবার গেল ম'রে।
চ'লে গেল তারা ভোরের তারার সাথে সাথে হাত ধরি';
ব'লে গেল তারা ;—'ব'লো বন্ধুরে আজিও অঝোরে ঝরি।'
দিয়ে গেল তারা মর্ম্মবৃন্তে ছোপানো উত্তরীয়;
ক'য়ে গেল তারা,—"শরতের শত শপথ স্মরিয়ো প্রিয়।"

হেরিনু বন্ধু,—বাদল-সন্ধ্যা বহি যায় কুলু কুলু,
ভেসে' এল তায় কোন্ সাঁঝদীপ, কোথাকার ঝিঙাফুল!

ভেসে যেতে যেতে ব'লে গেল তারা,—'ব'লো ব'লো বন্ধুরে,
এক গাঁয়ে ছিল বসতি মোদের আজ চলি কোন দুরে !
ব'লো তারে—মোরা আলো ক'রেছিনু যে কুটীর যে আঙিনা,
আজ বাদলের আঁধারে হয়ত কঠিন হবে তা চিনা,
তবু ব'লো তারে ভাই ;
সে ঘর আঙিনা আঁধারই রহিল, মোরা যাই ভেসে' যাই' ।

শুধা'ল নিশীথে তোমার গাঁয়ের চরের চক্রবাকী ;
'সন্ধান তার পেল কি বন্ধু, আমার হারানো পাখী ?
সে যে বলেছিল নিশি হ'লে ভোর আবার মিলিবি তোরা ;
এ জীবন ভোর হয় নিশি ভোর ; ভাঙ্গা ত লাগেনি জোড়া ।
ব'লো ব'লো ভাই, মোদের বন্ধু তোমার মিতারে ব'লো ;
তাদের গাঁয়ের অবুঝ পাখীর দিন-রাত এক হ'লো ।'

এমনি কত না এল রবাহূত, তাদেরই বারতা বহি'
এসেছি বন্ধু, বল তো কেমনে নিজ আনন্দ কহি ?
এসেছি বন্ধু, মাথায় ধরিয়া আকাশের মেঘভার,
যার বুকে তুমি সাতরঙা ধনু টঙ্কারো বার বার ;
এসেছি বন্ধু, দুপায়ে দলিয়া ঝরা বকুলের রাশ,
যে বকুল আজও তোমার গানের যোগায় জীবন শ্বাস ।
নিষেধ ক'রেছি শোনেনি বন্ধু, সঙ্গে এসেছে চলি'
তোমারই বুকের মালঞ্চ হ'তে কীটে কাটা ক'টা কলি ।

আপনা হারায়ে যারা বাড়াইল তোমার গানের গতি,
আপনা ফুরায়ে যারা পূরাইল তোমার প্রাণের ক্ষতি,
তাদের পক্ষে তোমারে হে কবি, দিনু অভিনন্দন,
সুন্দর যেন তোমারি ছন্দে তুলে তার ক্রন্দন ॥

---

* রসচক্রের উদ্যোগে কবি যতীন্দ্রমোহনের অভিনন্দন সভায় পঠিত।

॥ অনুবাদ ॥

কোজাগরী

রজনী গভীর হ'য়ে আসে,
ধ্রুবতারা জ্বলিছে আকাশে,
ধানক্ষেত কুয়াশায় হারা,
ঝিঁঝিঁভরা বেণুবনে চুপি চুপি চলেছে ইসারা।
প্রহরী পিটায় লোহা-কাঠের কাঁসর,
প্যাগোডায় ঘণ্টার স্বর,
দূরে দূরে কৃষকেরা মেতেছে ক্রীড়ায়,
আরও দূরে কুটীরে কে গায়?

রজনী গভীর হ'য়ে আসে।
কথা ক'য়ে যাই মৃদুভাষে,
পাশাপাশি ব'সে দুজনায়,
জীবন মধুর লাগে রজনীর প্রায়।
পাহাড়ের গায়ে
উঠে আসে রাঙা চাঁদ গাছে গাছে আগুন ধরায়ে।

ওই ধ্রুবতারা
জ্বলিতেছে ফানুসের পারা।
লঘু বায়ুভরে
শিশিরের কণাগুলি মুখে এসে পড়ে,
আসে দূর মাদলের ধ্বনি,
দুজনে বসিয়া থাকি সারাটি রজনী।

চৈত্র : ১৩৫৪ ॥ আনামের কবিতা।

বাঁশ-বাগান

কুটীর আমার ঘেরিয়া রয়েছে পুরানো বাঁশের বন,
ঘরের মেঝেয় ছড়ানো ছিটানো কত পুঁথি পুরাতন।
মধুর তাহার ছায়ায় বসিয়া আরাম লভিতে চাই,
সাধ হয় যত বড় কবিদের কবিতা পড়িয়া যাই।

অমনি আমার মনে প'ড়ে যায়,—
সেই যে জেলেটি, প্রতি সন্ধ্যায়
পাঁচতারা হাতে বেতের ডোঙায় গাহিয়া চলেছে গান,
জাল দেখে ফিরে নদী জলে জলে,
ডোঙাখানি তার স্রোতে ভেসে চলে
আপন মনের খেয়াল খুসিতে গাহে সারা দিনমান।

পরিণয় ডোরে বাঁধিবে আমারে দিয়ে গেল তার কথা,
সেই যে জেলেটি, ফিরে তো এল না, না জানি রহিল কোথা?
ফেলিয়া গেল সে মাঝ গাঙে মোরে,
ভাসিয়া বেড়াই কত?
গড়ায়ে গড়ায়ে স্রোতের মুখের
বেতের ডোঙার মত।

চৈত্র : ১৩৫৪ ॥ আনামের কবিতা ॥

স্বচ্ছ নদীর বালিকা

স্বচ্ছ নদীটি ন'টি বাঁকে বেঁকে চলে,
স্বচ্ছ নদীটি, অগাধ জলের তলে
সবার নয়ন হইতে আপন সবুজ বালুরে ঢাকে।
স্বচ্ছ নদীর ভরি দুই তীর সারাবেলা পাখী ডাকে;
ডিক্, ডিক্, ডিক্, ডিক্, ডিক্, ডিউ, ডিক্।

কে বালিকা তার পান্নার আঁখি মেলি'
দাঁড়ায়েছে ঐ মণ্ডপ দ্বারে হেলি'?
হৃদয়ে তাহার চাঁদের উদয়, তন্ময় প্রেম-গানে,
যে প্রেমের গান নদীর উজান বহিয়া আসিছে কানে।

আঙিনার পারে বাঁশের দুয়ার-ধারে,
আপনি স্বপন বিভোর করেছে তারে।
বিলম্ব আর নহে ক্ষণকাল,
ছাড়িয়া চলিনু ছায়ার আড়াল,
কবিতার কথা প্রণয় বারতা শুনাইব বালিকারে।

চৈত্র : ১৩৫৪ ।। আনামের কবিতা।

একক শয়নে

আলো করি নিজ নিশীথ শয়ন
অকাতরে তুমি ঘুমাও যখন
আমি না দেখিতে পাই,
স্বপন হইয়া ক্ষণতরে এসে
খেলা ক'রে যাব তব কালোকেশে,
সে আশাও মোর নাই।

তবু মনে মনে আছে বিশ্বাস,—
চিনি আমি তব পাশ-ফেরা শ্বাস
নির্ভরময় ললিত ভুজের
সর্ব সমর্পণ ;
যে রাত আমার হবে না প্রভাত
তুমি সে রাতেরি ধন।

চৈত্র : ১৩৫৪ ।। আরবীয় কবিতা ।।

মুঞ্জ তৃণ

আমরা ছিলাম দুই তীরে দুটি শ্যামল মুঞ্জ তৃণ,
ছোট্ট নদীটি মাঝখানে বহি' চলে।
পরস্পরের পরশ তো মোরা পেতাম না কোন দিনও
উপাড়িয়া যদি না নিত স্রোতের জলে ;
না আসিলে শীত কে বল বাঁধিত আমাদের দুই জনে
জমাট হিমের তুহিন-ঘুমের নিবিড় আলিঙ্গনে ?

চৈত্র : ১৩৫৪ ।। চীনদেশীয় কবিতা ।।

উইলো পাতা

জানালায় ব'সে স্বপন দেখে যে
ভালবাসি সেই মেয়েটিরে।
শিল্প-বাহার সৌধ তাহার
আছে বটে পীত নদীতীরে,
শুধু সেই জন্যেই ভালবাসিনে সে
মেয়েটিরে।
উইলো পাতাটি তারি হাত হ'তে
খ'সে পড়েছিল নদীনীরে,
তাই ভালবাসি সেই মেয়েটিরে।

বড় ভালবাসি পূবে হাওয়া।
পূব্‌ পাহাড়ের ফুলে ফুলে সাদা
পীচের সুরভি যায় পাওয়া।
শুধু সেই জন্যেই ভালবাসিনে গো
পূবে হাওয়া।
উইলো পাতাটি সেই এনে দিল
চলছিল যবে তরী বাওয়া,
তাই বড় ভালবাসি পূবে হাওয়া।

উইলো পাতাটি বাসি ভালো।
তারি মুখে শুনি নব বসন্তে
কবে ফের ধরা হবে আলো,
শুধু সেই জন্যেই পাতাটিরে নাহি
বাসি ভালো,
ফুল তোলা সূচে মোর নাম তাহে
মেয়েটি যে উৎকীর্ণা'ল
তাই উইলো পাতাটি বাসি ভালো।

চৈত্র : ১৩৫৪ ।। চীনদেশীয় কবিতা ।।

কমলা পাতার ছায়া

একেলা কিশোরী ঘরে
তোলে ঘাগরার 'পরে
সারাবেলা রেশমের ফুল।
সহসা বাঁশীর ধ্বনি,
শুনিয়া শিহরে ধনি,
কে যেন কিশোর তার চুমে শ্রুতিমূল।

কম্‌লার পাতাগুলি
বাতাসে উঠিছে দুলি'
মোমজামি জানালার পিছে।
ছায়াগুলি জানু 'পরে
ছুটোছুটী খেলা করে
কে যেন ঘাগরাখানি টানিয়া ছিঁড়িছে।

চৈত্র : ১৩৫৪ ।। চীনদেশীয় কবিতা ।।

বিয়ের প্রস্তাব

তরমুজেরি বীজের মত তোমার আঁখি কালো।
তরমুজেরি শাঁসের মত ঠোঁট দুখানি রাঙা,
সুডৌল তরমুজেরি মত মোহন কটিদেশ,
তোমারে লাগে বেশ।
আমার প্রিয় অশ্বী হ'তে তুমি যে সুন্দর,
নিতম্বটি তাহারো চেয়ে নিটোল দৃঢ়তর,
হাল্‌কা তালে তুল্‌কি চালে চলন তারি সম ;—
মহোৎসব করিব যদি এসো গো ঘরে মম।

এক্‌-এক্‌ দলে একশ' মেষ, একশ' হেন দল
চরছে তারা তরাই ছেয়ে হিমালয়ের তল।
তা থেকে বেছে আন্‌ব দুটি সব্‌সে-সেরা মেষ—
রেশ্‌মী লোম, নধর দেহ, গাঁট্টা-গোটা বেশ ;
পাণ্ডুঠাকুরের দেউলে দুজনে যাব চলি'
তোমার লাগি পুত্র মাগি' একটি দেব বলি।
আরেকটিরে জবাই ক'রে, গোলাপ-ডালে বিঁধে
গোটাকে-গোটা ঝল্‌সে নেব কাবাব কোরে সিধে।
ভোজের দিনে নিমন্ত্রিয়া করব আমি জড়ো
দেখতে যারা খুবসুরৎ, ভোজনে পানে দড়।

চলবে যবে খানা ও পিনা সমানে তিন রোজ,
তোমারে ঘিরে আমার ঘরে চলবে যবে ভোজ।
পরাব হাতে রূপোর বালা, পায়েতে পাঁয়জোর,
গলায় দেবো সোনার মালা, এস গো ঘরে মোর।

[Song of Kafiristan] চৈত্র : ১৩২৪

বসন্তে বাদল

কালকে বাদল ঝরেছিল সারারাত,
আজ ফিরে এল স্বচ্ছ সুপ্রভাত।
সিক্ত শ্যামল তালীকুঞ্জের সার,
বুক মেলে দিয়ে ছায়া ফেলিতেছে তার।
ব্যথার বাদল ঝরে তবু মোরে ঘিরে,
স্মৃতিভারাতুর ঘরটিতে মোর আসি যাই ঘুরে ফিরে।
আশপাশ হ'তে শ্যামল তরুর দল
শ্যাম ছায়া ফেলে জানালার পর্দায়,
শিশিরসিক্ত মখমলী শৈবাল
পরশে পরশে পুলকাঞ্চিত কায়,
কমলা রঙের জালি ওড়নার তলে
আংরাখাটির আবছায়া রাঙা গোলাপের বুকে টলে।
দেখি আর মনে হয়,—
চারিদিকে মোর সকলই আবার মধুর জীবনময়।
ছাদে গিয়ে বসি
করিবার কিছু নাই,
শুধু গুণে গুণে যাই,—
কত মাঠ,
কত পর্বত,
কত উপত্যকা,
কত নদী দিয়ে মোর বসন্ত পড়িল ঢাকা।

মাথাটা রেখে হাতে
চেয়েই আছি খাতার সাদা পাতে,
তুলির মুখে শুকিয়ে ওঠে কালি
দেখছি তাই খালি।
ঘুমিয়ে গেল প্রাণ,—
জাগবে কিনা কে জানে সন্ধান ?

ঝরতি রোদ্দুরে
খানিক আসি ঘুরে
ফুলের গায়ে বুলিয়ে হাত উঁচু শাখার চূড়ে।

ঐ তো বন কোমল-ঘন শ্যামল শোভাময়ী,
ঐ তো দূরে তুষার-ভাঙা
উজ্জ্বল রবিকিরণে রাঙা
নিপুণ-আঁকা শৈলরেখা কী সুন্দর ওই !

মেঘেরা দেখি চ'লেছে ধীরে ভেসে,
কাকেরা করে ব্যঙ্গ—শুনি কানে।
বসিয়া পড়ি আবার ঘুরে এসে
চাহিয়া থাকি সাদা পাতার পানে ;
ভুলি যে তবু আঁচড় নাহি টানে।

[Chang-Chi (770-850)] চৈত্র : ১৩৫৪

স্মৃতিকথা

যতীন আমার সমবয়স্ক, অন্তরঙ্গ ও অভেদাত্মা বাল্যবন্ধু।

এত কাল পরে সেদিন তার ইচ্ছা হয়েছে নিজের জন্মদিন নিয়ে একটা কবিতা লেখে। কিন্তু জন্মদিনটা মনে নেই, কারণ সেটার প্রয়োজন জীবনে হয়নি। আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'ভাই, তোর ত সবই মনে থাকে, আমার জন্ম-তারিখটা বলে দে।' আমি হেসে বললাম, 'মনে হচ্ছে, তোর কোষ্ঠীতে লেখা ছিল আষাঢ়স্য ত্রয়োদশ দিবসে।' কোষ্ঠী খুলে দেখা গেল সে জায়গাটা ছিন্ন, কীটদষ্ট। প্রায় ৬৪ বৎসরের পুরানো কাগজ, দোষ দেওয়া যায় না। যাই হোক, আমার কথায় বিশ্বাস ক'রেই যতীন জন্মদিন শীর্ষক কবিতা লিখে এনে আমায় শোনাল :—

মেঘের আড়ালে তেরই আষাঢ় চুপি চুপি চ'লে যায়,
অপরিচিতের মতন এবারও বিদায় দিবি কি তায় ?
বার বার বার তেরই আষাঢ় এসেছে গিয়েছে চলি',
নয়নধারায় করিয়া সিক্ত কোন কথাটি না বলি।
এবার সাধিয়া শুধাও তাহারে কি চাহে সে বলিবারে,
জীবনে যাহারে করিনি স্মরণ, বরণ করহ তারে।
তারি বক্ষের সজল শ্বাসে ভরি' লহ তব বুক,
এই দিনটির দর্পণে দেখ সারা জীবনের মুখ।
আজিকার কালো, রবি-শশাঙ্কে হয়নি কলংকিত.
কাল-সাগরের কৃষ্ণ কমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত !
ঢল ঢল তার নির্মম শোভা সনির্বন্ধ ডাকে,
তারি গন্ধের মেদুর ছন্দে সকল গগন ঢাকে,
তারি বুকে নেমে আলোকের পাখা হ'ল গুঞ্জনহীন,
মর্মের কোষে তপন তারকা তারি মধুপানে লীন।

---

*শ্রীবিপ্রতীপ গুপ্ত ছদ্মনামে লিখিত কবির এই আত্মস্মৃতি ১৩৫৬ সালে মাসিক বসুমতীর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

চির কলংকী ওরে কবি, তোর কী সৌভাগ্য বল্
এই দিনটির মৃণালে ফুটিল হেন সহস্রদল ॥
পেরেছিস্ কি রে চিন্‌তে ?
মরণ-কমল ফুটে আছে ওই জন্মদিনের বৃন্তে।
চেয়ে থাক্ চেয়ে থাক্
বন্দনাহীন অর্ঘ্যবিহীন নিশ্চল নির্বাক্।

এই কুড়ি ছত্রের কবিতাটি ১৩ই আষাঢ়ে আরম্ভ কোরে ১৫ই আষাঢ় শেষ হ'য়েছে ; আর জন্মদিন উপলক্ষে মৃত্যুকে টেনে এনে হাজির করেছে। যতীনের এই রকমই হয়। কবিতা শুনে বাহবা দিলাম ; কারণ, বুঝলাম, বন্ধু তাই চায়।

বাল্যে বা কৈশোরে যতীনের কবিতা-রোগ দেখিনি। ৮ বছর বয়সে সেই যে ম্যালেরিয়ায় ধরল, স্বরূপে বা বহুরূপী হ'য়ে আজ পর্যন্ত তাকে আর রেহাই দেয়নি। নদীয়া জেলার হরিপুর গ্রাম যার পিতৃভূমি, আর বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া যার মাতৃভূমি এবং জন্মভূমি, সে যে এখনও বেঁচে আছে এই আশ্চর্য! তার পাঁচ-ছয় ভাই-বোন কেউ শৈশব উত্তীর্ণ হয়নি।

১২ বছর বয়সে গ্রামের স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ ক'রে সে কলকাতায় গেল কাকার বাসায় থেকে পড়াশুনা করতে। বছর দেড়েক স্কুলে অধ্যয়ন করার পর হ'ল তার বিউবনিক প্লেগ। আমাদের পল্লীবাসীর দেহ তখনকার দিনে ম্যালেরিয়ার কাছে বন্ধক দেওয়া, সহরের প্লেগ আমল পেল না, যতীন সেরে উঠল। মাস ছয়েক পরে আবার তাকে ধরল তখনকার বাতশ্লৈষ্মিক বিকার, এখনকার টাইফয়েড। নাড়ী-টাড়ি ছেড়ে গেল, কিন্তু প্রাণ রইল। আমরা বললাম, 'যতীন, আর কলকাতায় গিয়ে কাজ নেই, পাশের গ্রামে হাইস্কুল হয়েছে, সেইখানে পড়ি চল্।' তাই হ'ল।

মাস কয়েক সেখানকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার পর যতীন আরও শীর্ণ হ'য়ে পড়ল। তার পিতা তখন বালেশ্বরে সামান্য চাকরি করেন। তিনি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি কোরে দিলেন।

জলহাওয়ার গুণে যতীন কয়েক মাসে মোটা হ'য়ে উঠল; কিন্তু বাপের গেল চাকরি। কলকাতায় ফিরে এসে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও ১৯০৩ খৃঃএ এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তরণ। বেনেটোলার মেসে যখন একসঙ্গে থাকতাম, তখন এক এক দিন বলতাম—যতীন, তোর জ্বর এলে লেপ চাপা দিয়ে স্কুলে যাই, ফিরে এসে কোন দিন দেখব মরে প'ড়ে আছিস্। সে বিস্কুট খায়, বীজগণিত কষে, আর হাসে।

সেদিনের জেনারাল এ্যাসেম্‌ব্লি (এখনকার স্কটিস্ চার্চ) কলেজ থেকে ১৮ বছর বয়সে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কোন্ লাইনে যাওয়া যায় এই নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন এক বন্ধু এসে বললেন, 'শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোষ্টেলে থাকতে পেলে জীবন ধন্য হ'য়ে যাবে। অভিভাবকের কোন বালাই নেই, তার উপর হোষ্টেল-প্রাঙ্গণের পুকুরে যে পদ্ম ফুটে থাকে তা তুলনাহীন।' পদ্মের লোভেই যতীন অভিভাবকদের মত করিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হ'তে গেল। এই ব্যাপারে তার কবিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আমাদের মনে প্রথম জাগে।…কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যে কি বস্তু, সে বিষয়ে যতীন বা তার অভিভাবকদের কোনই ধারণা ছিল না। পদ্ম-পুকুরের সন্নিকটে বসেই প্রাবেশিক পরীক্ষা করলেন সেখানকার ডাক্তার। বুকের মাপ, দেহের ওজন, সবই কম হ'ল। তখন ডাক্তার বাবু আর একটা পরীক্ষা করলেন। সেই তৃতীয় প্রহরের নিদাঘ-রৌদ্রে দূরের একটা অশ্বত্থ গাছ দেখিয়ে বললেন—ঐ পর্যন্ত জোরে ছুটে গিয়েই ছুটে ফিরে এস। হাঁপিয়ে গেলেও যতীন সেটা ভালোই পারল। কিন্তু সেই অবস্থায় তাকে যখন 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজ উল্টো ক'রে পড়তে দেওয়া হ'ল তখন আর পাশ-ফেল বোঝা গেল না। ডাক্তার বললেন তুমি বি-এ পড়গে যাও। সে যখন বারান্দা ছেড়ে নেমে যাচ্ছে, তখন ডাক্তার বাবু করুণাপরবশ হয়ে পাশ করিয়ে দিলেন; অর্থাৎ বুকের মাপ দেহের ওজন ইত্যাদি বাড়িয়ে লিখে দিলেন। আমরা ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্য কোমর বাঁধলাম।

লেখাপড়া যা হয় হ'তে লাগল, কিন্তু মুস্কিলে পড়া গেল ওয়ার্কশপ

নিয়ে। প্রথম বৎসর ছুতারখানার কাজ। প্রথমেই প্রত্যেককে রেলের স্লিপারের মত এক একটা কাঠ দিয়ে হাতকরাতের সাহায্যে সেটাকে ফালা-ফালা কোরে চিরতে বলা হ'ল। সেই সামান্য কাজটুকু সুসম্পন্ন করার পর আসল কাজ শেখানো হবে। দু'-তিন দিনের মধ্যে দু'হাতে ফোস্কা প'ড়ে, গ'লে, ঘা হ'য়ে গেল, কিন্তু কাঠ বিদীর্ণ হ'ল না। দু'-চার জন তার পরই সরে পড়লেন অভিভাবকদের বহু টাকা নষ্ট ক'রে। মনে হচ্ছে, বর্তমানের এক জন রাজ্যমন্ত্রী তাঁদেরই অন্যতম। ব্যাড্‌মিণ্টন খেলার মাঠে তিনি বাঁ হাতের কর্কে কিছুতেই ডান হাতের ব্যাট্ ঠেকাতে পারতেন না; সেও বোধ হয় কলেজ ছাড়বার আর একটা কারণ। ভালোই করেছিলেন; আজ তিনি ত্যাগধন্য ও দেশমান্য।

যাই হোক্, আমরা গরীবের ছেলে, প্রাণপণে কাজ ও পড়া চালিয়ে যেতে লাগলাম। যতীনের মাঝে-মাঝে জ্বর হয়, কিন্তু ডাক্তারখানায় কুইনাইনের দাম লাগে না, এবং কুইনাইন মিক্সচার খেয়েও যতীনের আর মুখ ধোবার বিশেষ দরকার হয় না। ডাক্তার পথ্য পাঠান—পাউরুটি আর মাংসের ঝোল। সে ডাক্তারটির বিশ্বাস ছিল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই বাঙ্গালীর ছেলেদের অত ম্যালেরিয়া হয়, বিশেষত শিবপুর কলেজের ঐ খাটুনির পর, মাত্র ডাল-ভাত খেয়ে। যারা সুস্থ তাদের কোন সাহায্য তিনি করতে পারতেন না, কিন্তু রোগী হ'লে তিনি ঐ প্রকার পথ্যের ব্যবস্থা করতেন।

বন্ধু মিহিরলালের সঙ্গে যতীনের তর্ক বেধেছে। মিহির বলে, রবীন্দ্রনাথের মত কবি বাংলায় জন্মায়নি। যতীন উত্তপ্ত হ'য়ে জানায়, নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' যে প'ড়েছে সে ও-কথা বলবে না। কিছু দিন পূর্বে আমরা কুরুক্ষেত্র পড়েছিলাম, মাইকেলের 'সীতা ও সরমা' অংশ, হেমচন্দ্রের 'অশোক তরু' প্রভৃতি দশ-বিশটা কবিতাও পড়া ছিল। বাল্যকালে পিসিমার কাশীরাম দাসের মহাভারতখানি যতীন দেখিয়ে-লুকিয়ে কয়েক বার শেষ করেছিল। গ্রামের মুচিপাড়া ও কুলোপাড়ায় বারোয়ারি পূজায় কবির গান ও তর্জার লড়াই আমরা শুনেছি। কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আমরা তখনও পড়িনি,

গান দু'-দশটা শুনেছি। মিহির মৃদু হেসে বলল—নবীন সেন ও রবীন্দ্রনাথে কি তফাত সেটা বোঝাবার জন্য রবি বাবুর কাব্যগ্রন্থাবলী তোমাদের দেব, আগামী বর্ষাবকাশে প'ড়ে দেখ, তার পরে তর্ক কোরো। মিহির-প্রদত্ত, আড়ে-দীঘে সমান, একখানি প্রকাণ্ড রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থাবলী নিয়ে ছুটির সময় হরিপুরে এলাম। পড়ে দেখে আমরা তো অবাক! হায় নবীন সেন! এই বিদ্যে নিয়ে মিহিরের সঙ্গে তর্ক করা হচ্ছিল। বয়স তখন উনিশ উত্তীর্ণপ্রায়। যতীন বললে ধরিত্রী দ্বিধা হও।

যাক্, ছুতারশাল-কামারশাল-কণ্টকিত বিদ্যার পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে পাশ কোরে যতীন ট্রেনিং নিতে ঢাকায় গেল। সেখান থেকে ফিরে পিতৃভূমি নদীয়ার জেলা-বোর্ডে চাকরি জুটল ১৯১৩ খৃঃএ। এই তার কর্মজীবনের সূত্রপাত। তখনকার জেলা-বোর্ডের প্রবীণ ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী কৃষ্ণনগরেই। প্রথম বয়সে কিছু দিন P. W. D.তে চাকরি ক'রে তিনি অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁদের বংশেরও ধনখ্যাতি ছিল। তার উপর তাঁর পরিবারবর্গ বলতে তিনি ও তাঁর পরিবার। সুতরাং অর্থের প্রয়োজন তেমন নয়। তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় ও সহকারী হিসাবে চাকরি আরম্ভ ক'রে যতীনের আর উপরি-পাওনা নেবার অবকাশ বা অভ্যাস হ'ল না। আমি বলেছিলাম, 'শুকনো মাহিনায় তোমার চলবে না! সংযম থাকলে মদ খেলেও মাতাল হয় না, চুরি করলেও চোর হয় না; আর শতকরা হিসাবে ঠিকাদারদের লাভের অংশমাত্র গ্রহণ করলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সেটা চুরি নয়।' যতীনের সাহসে কুলিয়ে উঠল না। ক্রমে দেখলাম, এ বিষয়ে তার একটা অহমিকাও জন্মে গেল।

প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের একটি প্রধান দোষ ছিল, তিনি সে সময় চোখে বিশেষ কিছু দেখতে পেতেন না। জেলা-বোর্ডের চাকরিতেই একটা এ্যাকসিডেণ্ট হ'য়ে একটি চোখ পূর্বেই নষ্ট হ'য়ে যায় এবং বাকিটিতে বেশ ঝাপ্‌সা দেখতেন। অতিশয় অমায়িক, সদাশয় পুরুষ; বোর্ডের সদস্যদের বিশেষ প্রিয়। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ বোর্ডের

চেয়ারম্যান্ বাঙ্গালী এবং তাঁর কৈশোরের বন্ধু। কার্যে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। সুতরাং সেই ঝাপসা-দেখা একটি চোখেই জেলা-বোর্ডের কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হচ্ছিল। কার্য্যপরিদর্শনে গিয়ে পল্লীপথে সাদা গরুকে ভদ্রমহিলা মনে কোরে তিনি পথের এক পাশে দাঁড়াতেন, আবার ভদ্রমহিলাকে গরু মনে কোরে লাঠি উঁচিয়ে পূর্বের ভ্রম সংশোধন ক'রে নিতেন, এমন রটনাও ওভারশিয়াররা করত। কিন্তু সে সব অবিশ্বাস্য কথা কোন দিন বোর্ডের মিটিঙে ওঠেনি।

এমন সময় এক জন বঙ্গবিশ্রুত দুষ্টপ্রকৃতি আধখ্যাপা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আগমন সম্ভাবনায় ইঞ্জিনিয়ার বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। ঐ সাহেবের এমন বদনাম ছিল যে, পূর্বে তিনি আর এক জন ইঞ্জিনিয়ারকে প্রহার দিয়েছিলেন। তিনি সত্য সত্যই এলেন এবং প্রথমেই বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানকে ছোট এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠালেন—'এই অন্ধ ইঞ্জিনিয়ার কত দিন হ'তে বোর্ডকে প্রতারিত করছে এবং বোর্ড তার নিকট কি পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাবী করতে পারে, আমায় জানানো হউক।' বিষয়টি বোর্ডের অধিবেশনে পেশ করতে হ'ল এবং সদস্যদের নির্বন্ধাতিশয়ে সাহেব-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ারকে এক বৎসরের ছুটি দিলেন, আর যতীনের উপর ভার পড়ল অস্থায়ী ভাবে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার। সাহেবের ইচ্ছা, ইতিমধ্যে এক জন উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার খুঁজে নেবেন।

এ-সাহেব যে-কোন সময় দু'-চার ঘা বসিয়ে দিতে পারে; সুতরাং যতীনকে প্রাণপণে চাকরি করতে হ'ল। সাহেব খুশি হলেন এবং অন্য ইঞ্জিনিয়ার খোঁজা বন্ধ করলেন। কিন্তু নদীয়া জেলার আবহাওয়ায় অতিপরিশ্রমে যতীনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'ল। সেটা হ'তে অবশ্য বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল। তার মধ্যে বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার ছুটি পান, আর যতীন কাজ চালিয়ে যান। এই অবস্থা। যতীনের চাকরি যখন পাকা হওয়ার কোন বাধা দেখা যাচ্ছে না, তখন ঘুঁটি কেঁচে গেল। সাহেব বদলি হ'য়ে গিয়েছেন, অন্ধ

ইঞ্জিনিয়ার অস্ত্রোপচারের ফলে আবার ঝাপ্সা দেখছেন, ম্যাজিস্ট্রেট্-চেয়ারম্যানের পরিবর্তিত হওয়ায় বেসরকারী চেয়ারম্যান পেয়ে বোর্ড পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন করায়ত্ত করেছে। সুযোগ বুঝে ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়ার মাত্র ছয় মাসের জন্য কাজে যোগ দেবার প্রার্থনা জানিয়ে দরখাস্ত করলেন। কিন্তু তার একটা অন্তরায় উপস্থিত হ'ল। বোর্ডের কাগজপত্রে দেখা গেল, তাঁর বয়ঃক্রম তখন চাকরির সীমারেখা অতিক্রম করেছে, অর্থাৎ আইনানুসারে তাঁর আর চাকরি করা চলে না। তিনি আর একটা সরকারী নথি থেকে নজীর দেখালেন, বয়স এখনও সীমারেখার মধ্যেই আছে। দু'টি বয়সের মধ্যে মাত্র ৫ বৎসর তফাত। আসলে, ছাপার দোষে ইংরাজি আট এক স্থানে তিন হ'য়েছে: আর আটটাই যে ঠিক সে বিষয়ে তাঁর বা অপর কারও কোন সন্দেহ ছিল না। যাই হোক্, দু'টি বয়সের মধ্যে কোনটি ঠিক, তাঁকে এফিডেবিট করতে বলা হল। এফিডেবিট না ক'রে তাঁর বয়স কত, সে বিষয় সিদ্ধান্ত করবার ভার তিনি বোর্ডের উপর দিলেন। বোর্ডের অধিবেশনে ভোটে তাঁর বয়স ধার্য করা হ'ল এবং তাঁকে ৬ মাসের জন্য কাজে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হ'ল। যতীন পেল ঐ ছ'মাসের ছুটি।

চাকা বিপরীত দিকে ঘুরছে। ভগ্নস্বাস্থ্য যতীন নেয় ছুটি, আর ঝাপ্সা-দৃষ্টি ইঞ্জিনিয়ার পান extension। স্বগ্রামে ব'সে যতীন চরকা চালায়, খদ্দর বোনায়, কিন্তু জেল খাটে না। একটা দেশলাইএর হাতকল কিনে গ্রামস্থ বালক-শ্রমিকের সাহায্য নিয়ে ভাবে এই দুই কুটিরশিল্পের দৌলতে গ্রামের উপকার এবং তারও জীবিকার সংস্থান হবে। স্বাস্থ্যের যে প্রকার অবস্থা তাতে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বোর্ডের চাকরি করবার আশা বা ইচ্ছা তার আর নেই। খদ্দরে আর সেদিনকার দেশী দেশলাইএ যে পেট ভরবে না, সে কথা সবাই বুঝছে, যতীন বুঝছে না। এমন সময়, প্রায় তিন বৎসর পরে তার জুটে গেল কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের এষ্টেটে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি। অত্যন্ত অনিচ্ছায়, আত্মীয়-স্বজনের আগ্রহে দেশলাই ফেলে এবং চরকা নিয়ে যতীন যোগ

দিলে সেই কাজে ১৯২৩ সালে, যখন তার বয়স ৩৬ বৎসর। সেই বৎসর তার প্রথম কবিতা-পুস্তক 'মরীচিকা' প্রকাশিত হয়। এর কবিতাগুলি কৃষ্ণনগরে চাকরি করবার সময় ও তৎপূর্বে রচিত। স্বাস্থ্যভঙ্গের তিন বৎসর যতীন কোন কবিতা লেখেনি।

কাশিমবাজারের চাকরিতে যোগ দিয়েই যতীনের ঘাড়ে আবার সাহেবই চাপল। ঋণগ্রস্ত মহারাজা স্থির করেছেন নিজের একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের পরিবর্তে এক দুঁদে ও অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান সাহেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন। তাই হ'ল এবং সাহেব এলেন। কৃষ্ণনগরের সাহেবটির মত এঁরও সুনাম আছে, প্রয়োজন হ'লে চাবুক চালাতে দ্বিধা করেন না। কাশিমবাজারের বৈষ্ণবরাজ্যে সাহেবি আমল প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কর্মচারীদের প্রায় সকলেরই চাকরি গেল, যতীন নূতন ব'লেই বোধ হয় চাকরিটা থাকল।

মহারাজা যে সাহেবটিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন, তিনি অপ্রতিহত প্রভাবে ছয় বৎসর রাজদণ্ড চালনা করেছিলেন। সাহেব প্রথমেই পুরাতন কর্মচারী ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন ক'রে নূতন নূতন লোক নিযুক্ত করতে লাগলেন। জমিদারী সেরেস্তার পুরোনো পদবী বাতিল হ'য়ে এ্যাকাউন্টেণ্ট, সুপারিনটেন্‌ডেন্ট, অডিটার ইত্যাদি নূতন পদে নিত্য নব লোকের আগমন সুরু হ'ল। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই গবর্নমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ কর্মচারী। বেতন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী, যোগ্যতাও বোধ হয় বেশী। প্রত্যহ নূতন নূতন বৃদ্ধের আগমন দেখে মহারাজারই এক বৃদ্ধ সুরসিক কর্মচারী এক দিন বললেন, এমনি ঘটনা এ রাজ্যে আর একবার ঘটেছিল। সকলে বিস্মিত হ'য়ে তাঁকে ঘিরে বসলে তিনি গল্প সুরু করলেন:

"তখনকার রাজা বর্তমান মহারাজার ন্যায় এমন খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন না, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু শাক্তপথেও চলতেন! পূজার সময় রাজবাটীর সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে যাত্রাগান চলছে; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একমনে শুনছে! রাজা চলেছেন সদর থেকে অন্দরমহলে। মাঝে নাটমন্দির পার হবার সময় দেখলেন, যাত্রার আসরে কে এক

জন লম্বিতশ্মশ্রু বৃদ্ধ চমৎকার বক্তৃতা করছে। রাজা পার্শ্বস্থ পারিষদকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ও কোন্ হ্যায় ?' পারিষদ করযোড়ে নিবেদন করল—'হুজুর, ও নারদ মুনি হ্যায়।' রাজা বললেন—'ও ত বহুৎ আচ্ছা বোলতা হায়, অউর মুনি হ্যায় ?' চারি দিকে সাড়া প'ড়ে গেল, যাত্রার অধিকারী রাজ-ইচ্ছা বুঝে তৎক্ষণাৎ বশিষ্ঠ মুনিকে আসরে নামালেন, যদিও বশিষ্ঠ মুনির সে সময় আসবার কোন কারণ ছিল না। রাজা বশিষ্ঠকে দেখে আরও মুগ্ধ হলেন, এবং হুকুম করলেন 'অউর মুনি লে আও।' তখনি আর এক জনকে পাকা দাড়ি পরিয়ে মুনি সাজিয়ে আনা হ'ল। রাজা তখন আসরে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসেছেন এবং হুকুম দিচ্ছেন—'অউর মুনি লে আও।' যাত্রার দলে যে কয়টা পাকা, ডাঁসা দাড়ি ছিল ফুরিয়ে গেল, তখনও রাজা মুগ্ধ হয়ে বলছেন—'অউর মুনি লে আও।' শেষে রাজবাড়ীর গুদাম থেকে শণ পাট বার করে তারি সাহায্যে মুনি সাজানো আরম্ভ হ'ল, এবং ডজন কয়েক মুনি যখন সারবন্দী হ'য়ে আসরে দাঁড়াল, তখন অধিকারী শাল বখ্‌শিস পেলেন। মশায়, সেই ইতিহাসই চোখের উপর পুনরাবৃত্ত হচ্ছে।"

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির কথায় আর একটা দৃষ্টান্ত মনে আসছে। শোনা যায়, দিল্লীর খেয়ালী সম্রাট্ মুহম্মদ বিন তোগলক্ তিন বার দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং প্রতিবারই হুকুমজারি হয়েছিল সমস্ত নাগরিকদের তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। কাশিমবাজারের সাহেবটিও প্রথমে তাঁর রাজধানী কাশিমবাজার থেকে বহরমপুরে নিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে আবার তাকে কলকাতায় টেনে নিয়ে যান। তিনিও প্রত্যেক বার হুকুম দিয়েছেন, চেয়ার টেবিল আলমারী কাগজ-পত্তর এবং আমলাবর্গ সকলে তাঁরই সঙ্গে স্থানান্তরিত হবে। আবার এমন ব্যবস্থাও করতে হবে, যাতে স্থানান্তর-করণের সময় আমলাদের একটি দিনও আফিস কামাই না হয়, অর্থাৎ শনিবারের দিন যে টেবিল-চেয়ারে ব'সে সাহেব ও আমলাবর্গ বহরমপুরে চাকরি করবেন সোমবারে ঠিক সেই-সেই চেয়ার-টেবিলে তাঁরা কলকাতায় যথারীতি

আফিস করবেন। এর ভার প্রধানত ইঞ্জিনিয়ারের উপর। কাশিমবাজারে মহারাজার সদর-অফিস এক বিরাট ব্যাপার। সুতরাং বানপ্রস্থী মহারাজা প্রত্যেক বারই নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। চেয়ার-টেবিল-কাগজের পাহাড়-প্রমাণ স্তূপ, সপরিবার আমলাদের ঠেলাঠেলি ভিড়, বর্ষার অবিশ্রাম বারিবর্ষণ ইত্যাদিতে মিলে সে এক অভুতপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু জবরদস্ত সাহেবের এমনই প্রতাপ ও দক্ষতা যে প্রকৃতই শনিবারের আফিস বহরমপুরে সেরে সোমবারের আফিস কলকাতায় বসেছিল। দেশ থেকে সাহেব তাড়িয়ে ভাল কাজ হয়নি।

ক্রমে মহারাজা বিরক্ত হয়ে এই প্রচণ্ড সাহেবটিকে সরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কণ্টক তুলতে কণ্টক চাই, সাহেব তাড়াতে সাহেবেরই প্রয়োজন।

নানা কৌশলে মহারাজা এষ্টেট দিলেন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্‌এর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এবারও যে সাহেবটি কর্ণধার হয়ে এলেন তিনি হাল হাতে করেই বললেন, ক্লাইভ ষ্ট্রীট থেকে আফিস অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে। নিজেই চৌরঙ্গী অঞ্চলে এক বাড়ী ভাড়া করলেন—যার উপরিতলে থাকবেন স্বয়ং সপরিবারে, আর নিম্নতলে বসবে আফিস। নিজের সুবিধা অনুযায়ী, সাহেব কারও সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই বাড়ী নির্বাচন কোরে রেখেছেন, এখন তাঁর ইঞ্জিনিয়ারকে করতে হবে তারই মধ্যে সকলের স্থান-সংকুলান। অনেক মাপ-জোখ হিসেব কোরে যতীন বললে—কোন উপায়েই এ-বাড়ীর নিম্নতলে সমস্ত আমলার বসবার স্থান করা যাচ্ছে না, উপরতলের কিছুটা না নিলে অন্তত কুড়িটি লোকের স্থানাভাব ঘটছে। সাহেব অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিলেন—ঐ কুড়ি জন আমলাকে বরখাস্ত করে দিলেই হবে। যতীন বললে—সাহেব, আর একবার মেপে দেখি। তার পর ভগ্নপ্রায় আস্তাবল মেরামত করিয়ে, বাথরুমগুলির কামোড ইউরিন্যাল সরিয়ে, বারান্দায় পর্দা টাঙিয়ে, কোন রকমে ঐ কুড়ি জনের জায়গাও হ'ল। এ সাহেব রাজত্ব

করলেন প্রায় পাঁচ বৎসর। এঁরই রাজত্ব কালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র দেহরক্ষা করেন।

তার পর থেকে বাঙ্গালী সাহেবের পালা। মহারাজার ঋণ শোধ না হ'য়ে ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছিল। সুতরাং বাঙ্গালী সাহেবদের বেতন খাঁটি সাহেবদের অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এই রকম নামতে লাগল। এঁরা সকলেই অবসরপ্রাপ্ত পাকা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সাহেব হ'লেও বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক। যিনি যখন এসেছেন তিনিই বলেছেন, পূর্বসূরিগণের দোষেই এষ্টেট ঋণমুক্ত হয়নি, আমার আমলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু ক্রমেই সব বেঠিক হ'তে লাগল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪২ সালে জাপানীরা ভাবছিল কলকাতায় বোমা ফেলব কি না। বোমা তখনও পড়েনি, কিন্তু কলকাতা প্রায় জনশূন্য হ'য়ে গেল। সেই সময় রাজধানী আবার কলকাতা থেকে বহরমপুরে ফিরে এল। আবার সেই আমলাদের সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার টেবিল আলমারী কাগজের বস্তা সচল হ'য়ে উঠল। সেই হুড়োহুড়ি, বিশৃঙ্খলা, অর্থের শ্রাদ্ধ। দীর্ঘ ১৩ বৎসর কলকাতায় কাটিয়ে যতীনও ফিরে এল বহরমপুরে।

কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ ঋণমুক্তির কোন ব্যবস্থাই করতে পারল না। দাঁড়ি-মাঝি মিলে যতই মারে টান্ হেঁইয়ো, ঋণভারে ভারী তরণী ততই যেন ভরাডুবির দিকে এগিয়ে যায়। শেষে, ১৯৪৪ সালে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র তাঁর বহুমূল্য কয়লা খনির অংশবিশেষ বিক্রয় কোরে নিজেকে ঋণমুক্ত করলেন, এবং জমিদারীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন।

১৯২৩ থেকে ১৯৫০; এই দীর্ঘকাল নানা বিপর্যয়ের মধ্যে যতীন কাশিমবাজার এষ্টেটেই চাকরি কোরেছে। সেই সূত্রে তাকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করতে হ'য়েছে। তার কর্মজীবনে যে-সব দুষ্টগ্রহের দৃষ্টি পড়েছিল, যে কারণেই হোক্, তারা কেউ মারাত্মক হয়নি; যতীনও তাদের ভ্রূকুটি-কুটিলকটাক্ষ এড়িয়ে মাঝে-মাঝে কবিতা লিখেছে, চরকাও কেটেছে। "মরীচিকা"র পরের সমস্ত কবিতাই তার কাশিমবাজারের চাকরির সময় লেখা।

সে খবর মহারাজা শ্রীশচন্দ্র ব্যতীত কর্তৃপক্ষের অপর কেহই বড় একটা রাখতেন না। কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পরই যতীন আমায় তার নতুন কবিতা শুনিয়ে দিল :—

ইট কাঠ চুণ বালি আনাইয়া গাড়ী গাড়ী
সারাটা জীবন শুধু গাঁথিনু পরের বাড়ী।
কত দুশ্চিন্তাই ঘটাতে বাসের সুখ,
আলো হাওয়া জল ড্রেন,—পাছে কোন হয় চুক্।
সে সব বাড়ীতে মোর কোন অধিকার নাই,
পথে পথে খুঁজি আজ মাথা গুঁজিবার ঠাঁই।

ছন্দ অর্থ আর ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বাছি,'
সকলই পরের তরে, কবিতা যা গাঁথিয়াছি !
অশ্রুসাগর সেচি' অহেতুক কৌতুকে
গাঁথিয়া গাঁথিয়া মালা দুলায়েছি বুকে বুকে।
হায় রে, আমার বলি সে-বুক সে-মালা কোথা,
যার পরশনে মোর জুড়াবে বুকের ব্যথা ?

বরাত সঙ্গে চলে, কিছু নাই বলিবার,
মিথ্যে হইনু কবি, মিছে ইঞ্জিনিয়ার।

এই ইঞ্জিনিয়ার-কবির, বা লোহার ফুলদানির, কর্মজীবনের কিছু পরিচয় দিলাম ; কাব্যপরিচয় দেবে তার কবিতা। তবে আমি জানি, এই পরিচয়ও খাঁটি সত্য হবে না। তার অধিকাংশ কবিতার পিছনে একটি ছোট্ট সূচের ইতিহাস আছে ; সেই সূচটাই আসল সত্য ; সঙ্গে সঙ্গে যে সব সূতো ঘোরাফেরা করেছে তারাই যতীনকে মিথ্যা কবি-খ্যাতি দিতে বসেছে। এদিক্ দিয়ে তার বরাত ভাল। আমার এমনও মনে হয়, যতীনের বাল্যের ম্যালেরিয়াই কুইনাইন দ্বারা অবদমিত হ'য়ে পরিণত বয়সে কাব্যরূপ গ্রহণ করেছে। এদিক্ থেকে দেখলে তার কবিতার প্রধান উৎসটি হয়ত ধরা পড়তে পারে।